ISSN-0971-8435

যোজনা

ধনধান্যে

জানুয়ারি ২০১৭ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ২২

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা

ভারতের সেনডাই পরবর্তী পদক্ষেপ
কিরেন রিজিজু

বিপর্যয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও সুস্থায়ী উন্নয়ন
পি. জি. ধর চক্রবর্তী

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা : প্রশিক্ষণ ও সামর্থ্যের পরিসর বৃদ্ধি
আর. কে. জৈন *এবং* ভি. থিরুপ্পুকাস

রাসায়নিক বিপর্যয় : মোকাবিলা কোন পথে?
এম. সূর্যনারায়ণন

বিশেষ নিবন্ধ

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা : 'ট্রমা' পরিচর্যার গুরুত্ব
ড. অমিত গুপ্তা *এবং* অধ্যাপক মহেশ চন্দ্র মিশ্র

ফোকাস

সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক : উল্লেখ ও বিপর্যয় ঝুঁকি হ্রাস
অধ্যাপক সন্তোষ কুমার

মোবাইলের মাধ্যমে তথা ডিজিটাল ব্যাংক লেনদেন প্রসারে উদ্যোগ

অনলাইন ব্যাংক লেনদেনের সুফল বিষয়ে আমজনতাকে অবহিত করে তোলাটা বর্তমানে সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এধরনের নগদহীন ব্যাংক লেনদেনে সাধারণ মানুষকে সড়গড় করে তুলতে যুব সমাজকে কাজে লাগাতে চায় আমাদের সরকার। এই লক্ষ্য পূরণের পথে এক ধাপ এগোতে নয়াদিল্লিতে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় 'যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রক'-এর উদ্যোগে যুব সম্প্রদায়ের জন্য এক প্রচারাভিযানের আয়োজন করা হয়; মোবাইলের মাধ্যমে তথা ডিজিট্যাল পদ্ধতিতে ব্যাংক লেনদেন প্রসার ঘটাতে। এই উদ্যোগের নাম রাখা হয়েছে #Youth4 Digital Paisa। পুরোভাগে রয়েছে নেহরু যুব কেন্দ্র সংগঠন।

ছয়শোরও বেশি তাজা তরুণ—কেবল দিল্লি শহরের বিভিন্ন অংশ থেকেই নয়—তার বাইরে বহু দূর দূর অঞ্চল থেকেও, যোগ দেয় এই প্রচারাভিযানে। নেহরু যুব কেন্দ্র সংগঠন একটি বিশেষ দল গঠন করে; যারা কিনা উপস্থিত এই সব তরুণের মধ্যে থেকে সরেজমিন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে তথা সাক্ষাৎকার নিয়ে সেরা একশো জনকে বেছে নেয়। নির্বাচিত প্রত্যেক তরুণ মন্ত্রকের নেহরু যুব কেন্দ্র সংগঠনের সঙ্গে এক মাসের জন্য জড়িত থেকে কাজ করবে। এই এক মাসের মধ্যে তাদের প্রত্যেককে ১০০-টি করে পরিবারকে অনলাইন ব্যাংক লেনদেনে সড়গড়/সচেতন করে তুলতে হবে। এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণের কাজে নির্বাচিত একশো জন তরুণের প্রত্যেকে দশ হাজার টাকা করে সম্মানদক্ষিণা পাবেন।❑

গ্রামীণ এলাকায় সবার জন্য আবাসন

আগামী ২০২২ সালের মধ্যে গ্রামে বসবাসকারী প্রত্যেক পরিবারের জন্য প্রাকৃতিক ঝড়ঝাপটা সামলাতে পারবে এমন সুরক্ষিত পাকাপোক্ত বাড়ির বন্দোবস্ত করতে সরকার গ্রামীণ এলাকায় 'সবার জন্য আবাসন' (Housing for All)-এর প্রস্তাব রেখেছিল। অবশেষে প্রধানমন্ত্রী চালু করলেন এই যোজনা। নাম রাখা হয়েছে 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)'। লক্ষ্য প্রথম পর্যায়ে ২০১৯ সালের মধ্যে এক কোটি গৃহ নির্মাণের কাজ শেষ করা। প্রতিটি গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে খরচের বরাদ্দের পরিমাণ বেশ ভালোরকম বাড়ানো হয়েছে। প্রত্যেক পরিবারকে বাড়ি তৈরির জন্য নূন্যতম সহায়তার পরিমাণ ধার্য হয়েছে দেড় লক্ষ থেকে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা। যদি সংশিষ্ট পরিবার চায় তবে তাদের ক্ষেত্রে সত্তর হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যাংক ঋণের বন্দোবস্ত থাকছে। এই যোজনার সুযোগ কারা পাবেন বা কারা পাবেন না—সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে 'আর্থ-সামাজিক জনগণনা ২০১১'-এর তথ্যের ভিত্তিতে। অর্থাৎ, পুরো প্রক্রিয়ায় কোনও অনিয়মের ঠাঁই ছিল না, সবটাই হয়েছে স্বচ্ছভাবে। তারপরেও গ্রামসভার মাধ্যমে আরেকবার যাচাই করা হয়েছে।

'Skill India', 'Digital India', 'Make in India', 'IT/DBT Aadhaar Platform' এবং 'প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা'—কেন্দ্রীয় সরকারের চলতি এই সব কয়টি গুরুত্বপূর্ণ যোজনা এক ছাতার তলায় আনার লক্ষ্যে এক বড়োসড়ো পদক্ষেপ হল "প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)"। এই কর্মসূচির দৌলতে ২০১৯ সালের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ৫ লক্ষ রাজমিস্ত্রির দক্ষতা বৃদ্ধির পরিসর থাকছে, 'কুশল ভারত' যোজনার আওতায়। একই সাথে, একেক অঞ্চলের গৃহ নির্মাণের নিদিষ্ট বৈশিষ্ট্য, পরিবেশগত দূর্বিপাকের ঝুঁকি এবং পরিবারগুলির প্রয়োজনীয়তা—ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত সমীক্ষা চালিয়ে গোটা দেশের জন্য ২০০-টি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের গৃহের নক্শা প্রস্তুত করা হয়েছে। রান্নাবান্নার আলাদা জায়গা, বিদ্যুতের বন্দোবস্ত, রান্নার গ্যাস, শৌচাগার তথা আলাদা স্নানের জায়গা, পানীয় জলের ব্যবস্থা ইত্যাদি সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা সমেত ঠিকঠাক আবাস গড়ে তোলা হচ্ছে। একাজে ব্যাপক মাত্রায় স্থানীয় কাঁচামাল/মালমশলা ব্যবহার করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য সর্বতোভাবেই গরিব গ্রামীণ পরিবারগুলির কল্যাণসাধন। তাই সঠিক পরিবারটিকে বাছাই এক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই বাছাই প্রক্রিয়াতে কোনওরকম ফাঁকফোকর যাতে রয়ে না যায় তা পুনরায় যাচাই করে নিতে তাই ব্যবহার করা হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) এবং মহাকাশ প্রযুক্তি। এ সংক্রান্ত পুরো টাকা-পয়সার লেনদেনের কাজ সম্পন্ন হচ্ছে আধার নাম্বার যুক্ত ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে। এই লেনদেনের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বচ্ছতা তথা বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে চিহ্নিত পরিবারের কাছে অর্থ পৌঁছাচ্ছে সরাসরি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে। পুরো বিষয়টি সম্পর্কে সংশিষ্ট ব্যক্তি/পরিবারকে অবহিত করার জন্য বিশেষ বন্দোবস্তও থাকছে। গ্রামাঞ্চলের রাজমিস্ত্রি পেশায় জড়িত ব্যক্তিদের জন্য এই কর্মসূচিতে কাজের জায়গাতেই হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের সংস্থান রাখা হয়েছে। ৪৫-দিনের এই প্রশিক্ষণের সুযোগের দৌলতে গ্রামের গরিব পরিবারগুলি দক্ষতা বৃদ্ধির সিঁড়ি বেয়ে কয়েক ধাপ উচুঁতে উঠতে পারছে।❑

জানুয়ারি, ২০১৭

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

সম্পাদক : **রমা মন্ডল**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯

ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দু-বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
www.facebook.com/bengaliyojana

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় — ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে — ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- ভারতের সেনডাই পরবর্তী পদক্ষেপ — কিরেন রিজিজু — ৫
- বিপর্যয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও সুস্থায়ী উন্নয়ন — পি. জি. ধর চক্রবর্তী — ৭
- বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা : প্রশিক্ষণ ও সামর্থ্যের পরিসর বৃদ্ধি — আর. কে. জৈন এবং ভি. থিরুপ্পুকাস — ১১
- রাসায়নিক বিপর্যয় : মোকাবিলা কোন পথে? — এম. সূর্যনারায়ণন — ১৫
- জীবাণুঘটিত বিপর্যয় : কার্যকারণ ও পরিত্রাণ — ড. অর্চনা সুদ — ২০

বিশেষ নিবন্ধ

- বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা : 'ট্রমা' পরিচর্যার গুরুত্ব — ড. অমিত গুপ্তা এবং অধ্যাপক মহেশ চন্দ্র মিশ্র — ২৬

ফোকাস

- সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক : উল্লেখ ও বিপর্যয় ঝুঁকি হ্রাস — অধ্যাপক সন্তোষ কুমার — ৩২

নিয়মিত বিভাগ

- যোজনা ক্যুইজ — সংকলক : রমা মন্ডল এবং পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী — ৩৬
- যোজনা নোটবুক — —ওই— — ৩৮
- যোজনা ডায়েরি — —ওই— — ৪০
- জানেন কি? — সংকলক : ভাটিকা চন্দ্রা — ৫৮

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা

বিপর্যয়, তা সে প্রাকৃতিক কারণেই হোক বা মানুষের হঠকারিতার ফলস্বরূপই—মানুষের বিবর্তনের অংশ, স্মরণাতীত কাল থেকেই। তত্ত্বগতভাবে বিশ্বাস করা হয়, মানুষের আবির্ভাবের আগে পৃথিবীর বুকে বিচরণ করে বেড়াত যে সব প্রাণী, তার মধ্যে ডায়নোসোর, ম্যামথ, সাইবেরিয়ার বাঘের মতো কিছু জীব পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পিছনে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত রয়েছে; জলবায়ু পরিবর্তন, বসতি অনুকূল পরিবেশ হারিয়ে যাওয়া, এমন কী উল্কাপাত! সিন্ধু সভ্যতার রহস্যময় অবলুপ্তির জন্যও ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন বিপর্যয়কেই দায়ি করে থাকেন—নদীর গতিপথ পরিবর্তন, খরা অথবা মহামারী। বাইবেল বর্ণিত নোয়ার নৌকা তৈরি করা হয়েছিল বন্যা, অর্থাৎ এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে জীব প্রজাতিগুলিকে রক্ষা করার জন্য।

ভারতীয় উপমহাদেশ বিশ্বের সব থেকে বেশি বিপর্যয় প্রবণ অঞ্চলগুলির অন্যতম। দেশের বর্তমান ভূকম্প অঞ্চল মানচিত্র অনুযায়ী, ভারতীয় ভূখণ্ডের ঊনষাট শতাংশ এলাকাতেই মাঝারি থেকে তীব্র ভূমিকম্পের আশঙ্কা রয়েছে। ৩২৯ মিলিয়ন হেক্টরের মোট ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে ৪০ মিলিয়ন হেক্টরেরও বেশি এলাকা বন্যা প্রবণ। গড়ে প্রতি বছর ৭৫ লক্ষ হেক্টর মতো জমি বন্যার কবলে পড়ে; ১,৬০০-এর মতো জীবনহানির ঘটনা ঘটে এবং বন্যার কারণে শস্য, ঘরবাড়ি ও জনসাধারণের সম্পত্তির মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮০৫ কোটি টাকার মতো।

সুতরাং, বিপর্যয় মানবজাতির কাছে কোনও অপরিচিত বিষয় নয়। খরা, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, রোগব্যাধি, ভূমিকম্প, সুনামি—সব রূপেই মানুষ একে চাক্ষুস করেছে। এবং, এখনও টিকে আছে। মানুষের অস্তিত্বের অলৌকিকত্ব এখানেই যে, পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়ার; কঠিন সমস্যা মোকাবিলা করার অনন্য ক্ষমতা রয়েছে তার মধ্যে। চেন্নাইয়ের সাম্প্রতিক বন্যার সময় তা আরও একবার প্রমাণিত হয়েছে। যখন মানবিকতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে মানুষ একে অপরের কাছে পৌঁছে গেছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। তবে, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার বিষয়টিকে শুধুমাত্র মানুষের প্রচেষ্টার উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। বিপর্যয়ের মোকাবিলা করতে গেলে আগে থেকেই কিছুটা প্রস্তুতির দরকার পড়ে, কিছু পরিকল্পনা জরুরি। সরকার এবং জনগোষ্ঠী উভয়ের তরফেই। কারণ, বিপর্যয় যখন সত্যি সত্যি এসে পড়ে, প্রস্তুতির অবকাশ তখন কোথায়? জরুরিকালীন পরিস্থিতিতে পরিচর্যা শুরু করার প্রশ্ন ওঠে না। বিপর্যয়-পূর্ব ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার রূপরেখা প্রস্তুতির জন্য তাই জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা সংস্থা (NIDM) এবং জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (NDMA)-এর মতো প্রতিষ্ঠান তৈরি করা অনিবার্য।

যোজনা

গোটা বিশ্ব জুড়েই নগরায়ন, জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং অবশ্যই পরিবেশের ক্রমাগত অবক্ষয় সূত্রে বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটে চলেছে আকছার। ফলত, জান ও মালের লোকসানের প্রবণতার লেখচিত্র বছরের পর বছর ধরে ঊর্ধ্বগামীই রয়ে যাচ্ছে। ১৯৮৪-র ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা, ২০১৩-র উত্তরাখণ্ডের বন্যা, ২০১১-র ফুকুশিমা দাইচি পরমাণু বিপর্যয় মৃত্যু এবং ধ্বংসের ভয়াবহ ছাপ রেখে গেছে। এই সব কয়টি বিপর্যয়ের জন্যই দায়ি মানুষের অপরিণামদর্শিতা এবং চেষ্টা করলে তা এড়ানো যেত।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রায়শই বিনা নোটিশে ঘাড়ে এসে পড়ে। উদাহরণ, ভারত মহাসাগরের আছড়ে পড়া সুনামি; যা পেছনে ছেড়ে যায় মৃত্যু ও ধ্বংসের ভয়াবহ রূপ। এহল মানুষকে প্রকৃতির নিজস্ব ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন। তবে তার মোকাবিলা সম্ভব। এজন্য বিপর্যয় পরবর্তী পরিস্থিতিতে দ্রুত হস্তক্ষেপ জরুরি। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে বিপর্যয় স্থলে পৌঁছাতে হবে। যে কোনও ধরনের আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য এই বাহিনীর প্রস্তুত থাকাটা এক অনিবার্য শর্ত। বাহিনীকে যত দ্রুত সম্ভব আটকে পড়া আহত মানুষের উদ্ধারকার্যে হাত লাগাতে হবে। আপৎকালীন চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য চিকিৎসক ও চিকিৎসা-কর্মীদের দলকে ছুটে যেতে হবে। বিপর্যয়ের অভিঘাতের দরুন মানুষের শরীরের আঘাতের থেকেও বেশি করে মনের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। সেই 'ট্রমা' কাটিয়ে ওঠার জন্য পরিচর্যা এই পর্যায়ে অত্যন্ত জরুরি; কারণ তা জীবন মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেয়। বিপর্যয় স্থলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে বের করাটাও আর একটা বড়ো মাথাব্যথার কারণ। মূলত এই কারণেই "ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স" গঠন করা হয়েছে।

জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলাটাও একই রকমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিপর্যয়ের অভিঘাত সামলাতে সামান্য সামান্য জ্ঞানও অনেক সময় অনেক কাজে আসে। মানুষকে, বিশেষত বিপর্যয় প্রবণ এলাকার অধিবাসীদের বিপর্যয়ের পূর্বানুমান বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। এবং বিপর্যয় সত্যি সত্যি ঘটলে কী ভাবে তার মোকাবিলা করা দরকার সেই প্রশিক্ষণও তাদের দেওয়া জরুরি। এক্ষেত্রে যোগাযোগের সুবন্দোবস্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। ওড়িশার সাম্প্রতিক বন্যা এর আদর্শ উদাহরণ হিসাবে পেশ করা যায়। যেখানে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় এই হাতিয়ার ব্যবহার করে চমৎকার সাফল্য পাওয়া গেছে।

কিন্তু শেষ কথাটি হল, বিপর্যয় অনিবার্য। আমরা তাকে থামাতে পারব না। কিন্তু তার অভিঘাতকে কমাতে পারি অবশ্যই। বিপর্যয় মোকাবিলায় নিজেদের জ্ঞান বাড়িয়ে বহু জীবনকে রক্ষা করতে পারি। ঠিক যেমন বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন বলেছেন—"An ounce of prevention is worth a pound of cure."❑

ভারতের সেনডাই পরবর্তী পদক্ষেপ

*প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি কমাতে রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে ১৮৮-টি দেশ এক চুক্তি করেছে। জাপানের সেনডাই শহরে অনুষ্ঠিত বিপর্যয় ঝুঁকি হ্রাস সংক্রান্ত তৃতীয় বিশ্ব সম্মেলনের এই চুক্তিতে সামিল আমাদের দেশও। সেনডাই চুক্তি রূপায়ণে ভারতের পদক্ষেপ নিয়ে কলম ধরেছেন—***কিরেন রিজিজু**

মার্চ ১৮, ২০১৫। এক ঐতিহাসিক দিন। ভারত সমেত রাষ্ট্রসঙ্ঘের ১৮৮-টি সদস্য দেশের ১৫ বছরের এক পরিকল্পনা গ্রহণের প্রত্যক্ষদর্শী ওই তারিখটি। পরিকল্পনাটির নাম "সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক"। জাপানের সেনডাই শহরে অনুষ্ঠিত বিপর্যয় ঝুঁকি হ্রাস সংক্রান্ত তৃতীয় বিশ্ব সম্মেলনে পরিকল্পনাটি গৃহীত হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই চুক্তিটির চারটি বড়ো অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্র ও সাতটি টার্গেট আছে। এগুলি পূরণ করতে হবে ২০৩০-এর মধ্যে। নতুন ঝুঁকি সৃষ্টির উপর রাশ টানা এবং বিপর্যয় ঝুঁকি যথেষ্ট কমানোরও প্রত্যাশা করা হচ্ছে এই চুক্তি মোতাবেক। সেনডাই ফ্রেমওয়ার্কের চারটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্র হল :

১) ঝুঁকি সম্পর্কে বোধ;

২) ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা;

৩) ঝুঁকি কাটিয়ে উঠতে লগ্নি;

৪) বিপর্যয় মোকাবিলার ক্ষমতা বাড়ানো এবং বিপর্যয়ের পর পুনর্নির্মাণ আরও ভালোভাবে করা।

ক্ষয়ক্ষতি বিশেষ কমানোর টার্গেট নিয়েছে এই সেনডাই চুক্তি। এর মধ্যে পড়ে বিপর্যয় হেতু জীবনহানি কম করা; বিপর্যয়ের দরুন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা, অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ এবং পরিকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা। সেইসঙ্গে, জাতীয় ও স্থানীয় স্ট্র্যাটেজি, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং আগাম সতর্কতার সুযোগ নেবার উন্নত ব্যবস্থা মারফত ক্ষমতা বাড়ানোর ডাক দিয়েছে এই চুক্তি।

পূর্ববর্তী ২০০৫-এর হিয়োগো চুক্তির পর এক দশকে বিপর্যয়জনিত ক্ষয়ক্ষতির তুলনায় এসব লক্ষ্য পূরণে অগ্রগতি মাপার জন্য নির্দিষ্ট সূচকের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছে নতুন ফ্রেমওয়ার্ক।

হিয়োগো চুক্তি মোতাবেক সরকার ও সংশ্লিষ্ট অন্য সব পক্ষের কাজ চালিয়ে যাওয়ার দিকে নজর দিয়ে সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে। ঢোকানো হয়েছে কিছু নতুন দিকও। ভারতের বেলায় এই ফ্রেমওয়ার্ক বিপর্যয় ঝুঁকি হ্রাস এবং বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি সামলানোর উপর আমাদের অঙ্গীকারে ফের জোর দিয়েছে।

সেনডাই চুক্তিতে দেওয়া তার প্রতিশ্রুতি পালন করতে, সরকার **এই চুক্তি ঘোষণার পর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে।** এক, সেনডাই সম্মেলনের দেওয়া কথামতো, ভারত ২০১৬-র নভেম্বরে **বিপর্যয় হ্রাস সংক্রান্ত মন্ত্রী স্তরের এশিয়া সম্মেলনের আয়োজন করে।** বৈঠকে গৃহীত হয় দিল্লি ঘোষণা এবং সেনডাই চুক্তি রূপায়ণের জন্য আঞ্চলিক তৎপরতা পরিকল্পনা। সেনডাই ফ্রেমওয়ার্কে উল্লেখিত বিপর্যয় ঝুঁকি কমাতে সমাজের সবাইকে সামিল করার ধ্যানধারণার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই সম্মেলন এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সেনডাই চুক্তিকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে একজোট হওয়ার ও নির্দিষ্ট অঙ্গীকার করার সুযোগ দিয়েছে। সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সেনডাই চুক্তি কার্যকর করতে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা নেবে। এই অঞ্চলে চুক্তিটি আশু রূপায়ণের প্রয়োজনীয়তার দিকটিও সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বিপর্যয় ঝুঁকি হ্রাসে আরও উদ্যম নিয়ে নেমে পড়ার জন্য তুলে ধরেন এক দশদফা কর্মসূচি (নিবন্ধের মধ্যে এই কর্মসূচিটি দ্রষ্টব্য)।

দুই, সেনডাই চুক্তি ২০১৫-২০৩০ এর লক্ষ্য, টার্গেট ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভারত সরকার এক গোছা কাজের তালিকা পাঠিয়ে দিয়েছে রাজ্যগুলিকে। দিল্লি সম্মেলন চলাকালে, ভারত সরকার এশীয় অঞ্চলে বিপর্যয় ঝুঁকি কমানোর জন্য সেনডাই চুক্তি কার্যকর করতে ইউনাইটেড নেশনস ইন্টারনাল স্ট্র্যাটেজি ফর ডিজাস্টার রেজলিউশনকে দশ লক্ষ ডলার অনুদান দিয়েছে।

তিন, সেনডাই চুক্তির ৪নং অগ্রাধিকারের সঙ্গে সংগতি রেখে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে করা হয়েছে আরও শক্তিশালী। পেশাদার বাহিনী হিসেবে এর শক্তি বাড়ানোর জন্য অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ ও সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া, ২৫০ কোটি টাকার এক রিভলভিং ফান্ডের মাধ্যমে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা রিজার্ভ গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত সরকার। এই তহবিল থেকে কোনও প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের পর জরুরি ভিত্তিতে দরকারি সামগ্রী, যেমন—তাঁবু, ওষুধপত্র, খাবার ইত্যাদি কিনে এক ভাঁড়ার তৈরি করতে পারবে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

চার, বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য অন্যান্য দেশকে ভারতের কুশলতা ও অভিজ্ঞতার

দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বিপর্যয় হ্রাস সংক্রান্ত এশিয়া মন্ত্রী সম্মেলনে বিপর্যয় ঝুঁকি কমাতে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখিত দশদফা কর্মসূচি

১) নিশ্চিত করতে হবে যে যাবতীয় উন্নয়ন প্রকল্প—বিমানবন্দর, সড়ক, খাল, হাসপাতাল, স্কুল, সেতু তৈরি করা হয় উপযুক্ত বিপর্যয়-প্রতিরোধী স্ট্যান্ডার্ড মাফিক এবং তা সমাজের বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতায় অবদান রাখে। বিপর্যয় সামলানোর পরিকাঠামোকে সাহায্য করতে জোট গড়া।

২) সবাইকে ক্ষয়ক্ষতি পূরণ ব্যবস্থার আওতায় আনার লক্ষ্যে কাজ করা—গরিব পরিবার থেকে শুরু করে ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ, বহুজাতিক সংস্থা মায় রাষ্ট্র ইস্তক।

৩) বিপর্যয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় মহিলাদের আরও বেশি অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদানে উৎসাহ জোগানো।

৪) বিশ্বে যাবতীয় দুর্বিপাকের জন্য ঝুঁকির নকশা ছকতে লগ্নি।

৫) আমাদের বিপর্যয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রচেষ্টার দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো।

৬) বিপর্যয় ইস্যুগুলি নিয়ে কাজ করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে এক সমন্বয়ের বিকাশ।

৭) সোশ্যাল মিডিয়া ও মোবাইল প্রযুক্তির সদব্যবহার।

৮) স্থানীয় স্তরে ক্ষমতা ও উদ্যোগ গঠন।

৯) কোনও বিপর্যয় থেকে শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া না করার দিকটি সুনিশ্চিত করা। বিপর্যয়ের পর ঘরবাড়ি পুনর্নির্মাণে কারিগরি সহায়তা জোগানোর এক ব্যবস্থা গঠন।

১০) বিপর্যয় সামলে উঠতে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় আরও বেশি সমন্বয় আনা।

ভাগ দিতে সরকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে এবং দিতে চেয়েছে সাহায্য। ২০১১-য় জাপান ভূকম্প এবং ২০১৫-এ নেপাল ভূকম্পের পর ভারত সাহায্য করেছিল। অঞ্চলে বিপর্যয় ঝুঁকি হ্রাস ও সার্ক দেশগুলির মধ্যে জ্ঞান-অভিজ্ঞতা আদানপ্রদানের জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা বিকাশের নিরন্তর প্রচেষ্টায় ভারতে সার্ক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র গঠনে সরকার যাবতীয় সাহায্য করেছে। ২০১৫-এ দিল্লিতে চলে সার্ক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা মহড়া। সদস্য দেশগুলির মধ্যে বিপর্যয় সংক্রান্ত আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় জোরদার করতে সরকারের অঙ্গীকারের এ এক প্রতিফলন। অনুরূপভাবে, হায়দরাবাদের ন্যাশনাল সেন্টার ফর ওশান ইনফরমেশন সার্ভিসেস, শুধুমাত্র ভারত নয়, ভারত মহাসাগর বলয়ের ২৮-টি দেশকেও আগাম সতর্কতা জানিয়ে দেয়।

পাঁচ, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে ক্ষমতা বা সামর্থ্য বাড়ানোর প্রচেষ্টায়, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে বিপর্যয় সংক্রান্ত গবেষণায় এক উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়তে আর্থিক সাহায্য ও অধ্যয়ন বিষয়ক সহযোগিতার জন্য প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে ২০১৫-র আগস্টে সমঝোতাপত্র সই করেছে জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান (NIDM)। এছাড়া, প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি জোরদার করার অঙ্গ হিসেবে, নাগপুর ন্যাশনাল সিভিল ডিফেন্স কলেজে প্রতিষ্ঠা করেছে ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স একাডেমি। বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা ও মোকাবিলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য। ন্যাশনাল ফায়ার সেফটি কলেজকে অত্যাধুনিক করার জন্য সরকার বরাদ্দ করেছে ২০৫ কোটি টাকা। বিপর্যয় ঝুঁকি সমাধানকে পরিকাঠামো উন্নয়নের আওতায় আনার জন্য বিশেষত পাহাড়ি রাজ্যগুলিতে কাজ করে চলা পরিকাঠামো উন্নয়ন এজেন্সিগুলিকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ধরনধারণ নিয়েও আমরা চিন্তাভাবনা করছি।

সেইসঙ্গে, চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশে সায় দিয়ে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল বাবদ ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০-র জন্য সরকার বরাদ্দ করেছে ৬১,২২০ কোটি টাকা। এর মধ্যে কেন্দ্রের দেয় ৪৭,০২৯.৫০ কোটি টাকা এবং রাজ্যের দায় ১৪,১৯০.৫০ কোটি টাকা। ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫ সালের জন্য ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশের চেয়ে ৩৩,৫৮০.৯৩ কোটি টাকা বেশি। এই তহবিল ছাড়াও ভয়াবহ বিপর্যয়ে দরকারমাফিক বাড়তি টাকাকড়ি জোগায় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। ২০১৫-১৬-এ বিভিন্ন বিপর্যয় মোকাবিলায় রাজ্য সরকারগুলি পেয়েছে মোট ১৭,৭৪৯.১৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর অংশভাক ৫,২৯৭.২২ কোটি।

সাত, বিপর্যয় সংক্রান্ত ঝুঁকি কমাতে রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্বের কথায় ফের জোর দিয়েও, বিপর্যয়ের জন্য প্রস্তুতি ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের পরিকল্পনা এবং সেইসঙ্গে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে বেসরকারি ক্ষেত্র-সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদেরও সামিল হওয়ার ডাক দিয়েছে সেনডাই চুক্তি। বিপর্যয় ঝুঁকি হ্রাস মিশনে নির্ভরযোগ্য ও সাধ্যায়ত্ত আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার ও **দেওয়ানেওয়ার** মাধ্যমে ঝুঁকি কমানোর ব্যবস্থাদি শক্তপোক্ত করতে চাই সরকারি এবং বেসকারি সব পক্ষের একযোগে কাজ করা। ভারত সরকার মনে করে যে স্থায়ী পরিকাঠামোয় দ্রুত শহরায়নের দরুন উদ্ভূত বিপত্তি-সহ যাবতীয় পরিস্থিতিকে হিসেবের মধ্যে ধরতে হবে। ২০১৬-র নভেম্বরে দিল্লির বিপর্যয় হ্রাস সংক্রান্ত মন্ত্রীস্তরের এশিয়া সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে এই অঞ্চলে ঝুঁকি কমানোর জন্য রাজনৈতিক অঙ্গীকারের কথা ফের জোর দিয়ে বলা হয়েছে। স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের ঝুঁকি, চ্যালেঞ্জ সনাক্ত করা এবং দুষ্প্রাপ্য সহায়-সম্পদ সমবণ্টনের জন্য ভবিষ্যতের স্ট্র্যাটেজি বা কর্মকৌশল উদ্ভাবনে সাহায্য করবে এই দিল্লি ঘোষণাপত্র।❑

(লেখক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং এশীয় অঞ্চলের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ মনোনীত বিপর্যয় সংক্রান্ত ঝুঁকি হ্রাস এর প্রধান প্রবক্তা।)

বিপর্যয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও সুস্থায়ী উন্নয়ন

*গত বছর যে তিনটি আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তার প্রতিটি চূড়ান্ত করার পেছনে ভারতের অবদান রয়েছে। ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ জনবহুল দেশ, অর্থনীতির মাপকাঠিতে বিশ্বে তার স্থান ষষ্ঠ এবং দ্রুততম বিকাশশীল দেশগুলির মধ্যেও সে অন্যতম। অন্যদিকে আবার এই ভারতেই রয়েছে বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক চরম দারিদ্র্যকবলিত মানুষ, অপুষ্টিপীড়িত শিশু এবং নিরক্ষর বয়স্কজন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে সুস্থায়ী উন্নয়ন ও বিপর্যয় স্থিতিস্থাপকতার আন্তর্জাতিক লক্ষ্যপূরণে ভারতের ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। লিখেছেন—*****পি. জি. ধর চক্রবর্তী**

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা (Disaster management) বলতে আগে যেখানে বোঝাত উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা সেখান থেকে অনেকটা সরে এসে এখন বিষয়টির অভিমুখ 'Risk management' বা বিপর্যয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায়। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় লক্ষ্য থাকে নিহিত বিপদ ও দুর্বল দিকগুলিকে, তা মনুষ্যসৃষ্ট বা প্রাকৃতিক যে কারণেই হোক না কেন, যাচাই করে প্রয়োজনীয় আগাম ব্যবস্থা নেওয়া এবং একেবারে গোড়া থেকেই ঝুঁকি সৃষ্টির কারণগুলি প্রতিহত করতে সচেষ্ট থাকা। এছাড়াও রয়েছে ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্যের আদান-প্রদানে উদ্ভাবনমূলক প্রয়াস ও ঝুঁকি বিমা-সহ বিভিন্ন ধরনের কাঠামোগত ও অ-কাঠামোগত সম্মিলিত ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদ্যমান ঝুঁকিগুলিকে কম করার উদ্যম। অবশিষ্ট যেসব ঝুঁকিকে প্রতিহত, কমানো অথবা বিমার আওতায় আনা যাচ্ছে না সেগুলির ক্ষেত্রে অবশ্য বিপর্যয়ের জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত থাকা ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই। বিপর্যয়-এর জন্য প্রস্তুতির অন্যতম উদ্দেশ্য হল অঘটন ঘটার ক্ষেত্রে ঠিকমতো সতর্ক থাকা যাতে করে তড়িঘড়ি কাজে নেমে পড়ে পীড়িত মানুষের জীবন বাঁচানো এবং তাদের দুঃখদুর্দশা যতদূর সম্ভব লাঘব করা সম্ভব হয়। এজন্য জোর দেওয়া হয়ে থাকে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ ও বিপন্ন মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে আনার ওপর। প্রস্তুতিপর্বে সঠিক নীতি-কৌশল ও আর্থিক সংস্থানের বিষয়গুলিও গুরুত্ব পেয়ে থাকে যার সাহায্যে বিপর্যয়-কবলিত এলাকায় উন্নততর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনা তথা নতুন করে ঘর-বাড়ি ও পরিকাঠামো গড়ে তোলার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

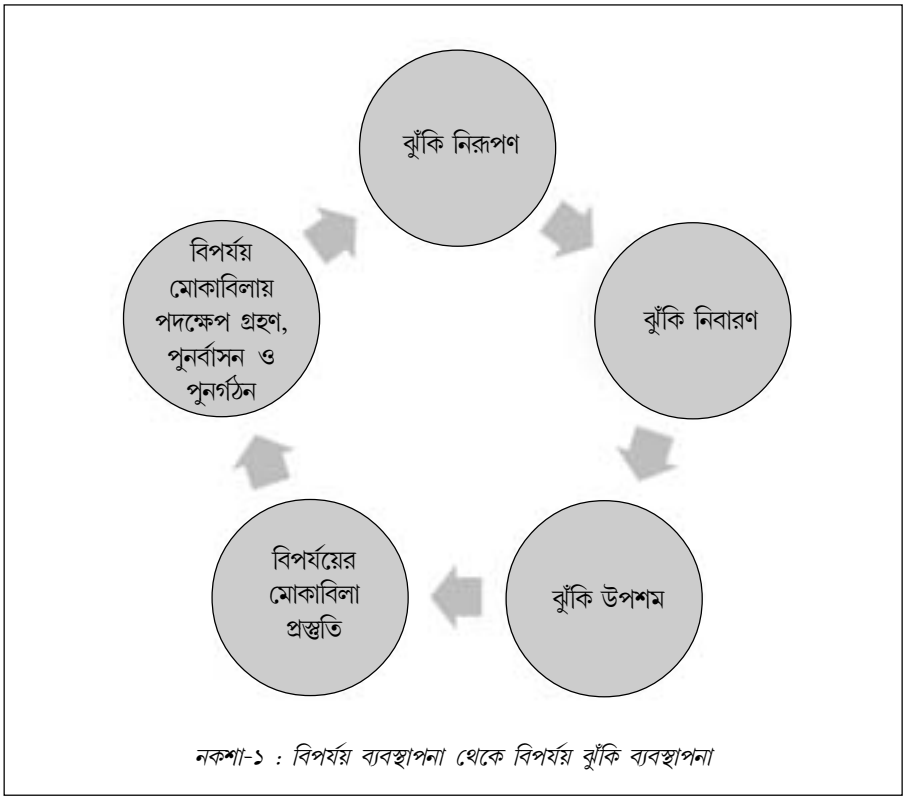

নকশা-১ : বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা থেকে বিপর্যয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

বিপর্যয়-পরবর্তী আঘাত লাঘব করার উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও এ ধরনের সঙ্কটকালে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেড়েই চলেছে। এই প্রেক্ষিতেই সুসাধ্য ও সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিপর্যয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অনুধাবন করা দরকার। UN office for Disaster Reduction (UNISDR) বা বিপর্যয় হ্রাস সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘ কার্যালয়ের এক হিসাব অনুযায়ী বিগত দুই দশকে একাধিক বিপর্যয়ের কারণে ১০ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ৪৪০ কোটি মানুষ এবং

আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে।

ক্ষয়ক্ষতির বহর ভারতেও কিছু কম নয়। বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষায় দেখা যায় গত শতকের নব্বইয়ের দশকের শেষদিকে এবং চলতি শতকের গোড়ার দিকে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (GDP) প্রায় ২ শতাংশের কাছাকাছি; যে পরিমাণ অর্থ এ দেশে জনস্বাস্থ্য খাতেও খরচ করা হয় না।

বিপর্যয় ও উন্নয়ন

এক ত্রিমাত্রিক বন্ধনসূত্রে বিপর্যয় ও উন্নয়নের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, বিপর্যয়ের ফলে বহু বছর তথা বহু দশকব্যাপী অর্জিত উন্নয়নের সুফলগুলি বাধাপ্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয়ত, দুর্বলতর শ্রেণীভুক্ত মানুষজন উন্নয়নের অভাবে বিপর্যয়জনিত ঝুঁকিগুলির সম্মুখীন হতে বাধ্য হন। তৃতীয়ত, এটা ভাগ্যের পরিহাস যে, এই উন্নয়নের দরুনই নতুন নতুন বিপর্যয় ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, স্থানিক ত্রুটি ও নির্মাণ কাজের নিয়মনীতি অগ্রাহ্য করে যেসব বাড়ি-ঘর ও পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে সেগুলি বিপদগ্রস্ত হবার আশঙ্কা থেকে যায়; পরিবেশগতভাবে স্পর্শকাতর স্থানে খনন ও শিল্প স্থাপনের দরুন বিপর্যয় মোকাবিলার প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা ক্ষুণ্ণ হতে পারে এবং জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক উৎপাদন ও প্রয়োগ ব্যবস্থা আবহাওয়াজনিত বিপর্যয়ের ঝুঁকিকে বাড়িয়ে দেয়।

২০১৫ : নতুন চালিকাশক্তি

বিপর্যয় স্থিতিস্থাপক সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্দ্ধমান আকাঙ্ক্ষা ২০১৫-তে এক নতুন গতিবেগ পায়। এই সময় তিনটি সমান্তরাল অথচ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল প্রক্রিয়া মিলিতভাবে পরবর্তী এক অথবা অর্ধদশক এবং তৎপরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডাকে সংজ্ঞায়িত করে। প্রথমটি হল ২০১৫-'৩০-র বিপর্যয় ঝুঁকি সংক্রান্ত সেন্ডাই কাঠামো, যা কিনা জাপানের সেন্ডাই শহরে ২০১৫-এর মার্চে গৃহীত হয়েছিল। সেন্ডাই কাঠামোতে এই প্রথমবার বিপর্যয় ঝুঁকি হ্রাস সংক্রান্ত সাতটি ফলাফল ভিত্তিক বিশ্বব্যাপী লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। এগুলির মধ্যে রয়েছে বিপর্যয়জনিত মৃত্যুহার, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা এবং তাদের প্রত্যক্ষ আর্থিক ও গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোর ক্ষতিকে যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনা এবং পাশাপাশি বহুমুখী বিপদ সম্পর্কে আগাম সতর্ক ব্যবস্থার প্রসারণ ঘটানো এবং বিপর্যয় মোকাবিলায় আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। সেই সঙ্গে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বিপর্যয় ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য চারটি কর্মপরিকল্পনার ওপর। এগুলি হল :

(১) বিপর্যয় ঝুঁকি বিষয়ে সম্যক পরিচিত;

(২) স্বাভাবিক অবস্থা ফেরানোর জন্য বিপর্যয় ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে বিনিয়োগ;

(৩) বিপদ মোকাবিলার উদ্দেশ্যে ঝুঁকি প্রশাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা; এবং

সারণি-১

সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা	বিপর্যয় ঝুঁকি স্থিতিস্থাপকতার টার্গেট
লক্ষ্য ১ : সকল প্রকার দারিদ্র্য দূরীকরণ	টার্গেট ১.৫ : আবহাওয়াজনিত চরম বিপর্যয় ও অঘটন থেকে দরিদ্রদের বাঁচানো
লক্ষ্য ২ : ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও সুস্থায়ী কৃষি বিকাশ	টার্গেট ২.৪ : আবহাওয়া পরিবর্তন, প্রতিকূল আবহাওয়া, খরা, বন্যা ও অন্যান্য বিপর্যয়ের সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা
লক্ষ্য ৩ : সুস্থ জীবনযাপনের সুনিশ্চিতকরণ	টার্গেট ৩.৬ : দ্রুত সতর্কীকরণ ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিপর্যয় ঝুঁকি হ্রাস করা
লক্ষ্য ৪ : সকলের জন্য সুষম মানের শিক্ষা	টার্গেট ৪ক : শিক্ষাস্থলগুলিকে বিপর্যয়ের আঘাত থেকে রক্ষা করা
লক্ষ্য ৯ : স্থিতিস্থাপক পরিকাঠামো নির্মাণ	টার্গেট ৯.১ : বিপর্যয় স্থিতিস্থাপক নির্ভরযোগ্য ও উচ্চমানের পরিকাঠামো তৈরি করা
লক্ষ্য ১১ : শহর ও জনপদগুলিকে নিরাপদ, স্থিতিস্থাপক ও সুস্থায়ী করা	টার্গেট ১১.৫ : জীবনহানি ও আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি যতদূর সম্ভব হ্রাস করা
লক্ষ্য ১৩ : জলবায়ু পরিবহণ ও তার প্রভাবকে প্রতিহত করা	টার্গেট ১৩.১ : জলবায়ু ও প্রাকৃতিক কারণজনিত বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে স্থিতিস্থাপকতা ও অভিযোজন গড়ে তোলা
লক্ষ্য ১৫ : জমির অবনমন রোধ করা	টার্গেট ১৫.৩ : খরা ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জমির পুনরুজ্জীবন

"ভারতে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন স্তরে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা চালু হয়েছে। বিপর্যয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সক্ষমতার প্রয়োগ ঘটায় হ্রাস পেয়েছে জীবনহানির আশঙ্কা। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘূর্ণিঝড়ে (যেমন, ফাইলিন ও হুদহুদের ক্ষেত্রে) এসব ইতিবাচক ফলাফল লক্ষ্য করা গেছে। অবশ্য এটাও স্বীকার করতে হয় যে, বন্যা বা অকস্মাৎ প্রবল বৃষ্টিপাতের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে (উত্তরাখণ্ড, শ্রীনগর ও চেন্নাই) অথবা ধস নামার মতো ভূ-তাত্ত্বিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে (মালিন ও উত্তর সিকিম) সমমানের সাফল্য আসেনি।"

(৪) কার্যকর তৎপরতা, পুনরুদ্ধার, পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণের স্বার্থে আরও বেশি প্রস্তুতি।

সুস্থায়ী উন্নয়নের ২০৩০ এজেন্ডাটি রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে অনুমোদিত হয়। এতে রয়েছে ১৭-টি সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে আটটির ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সংস্থান; যার প্রতিটিতে উন্নয়নের বিভিন্ন সেক্টর বা বিভাগে সুনির্দিষ্ট বিপর্যয় স্থিতিস্থাপকতা তৈরি করার প্রস্তাব।

বিপর্যয় হ্রাস সম্পর্কে "সার্বিক পরিচিতি, কর্মপরিকল্পনা ও সহায়তা"-র প্রসার ঘটাতে আটটি সুনির্দিষ্ট প্রকৌশল গ্রহণের কথা উল্লেখিত হয়েছে ২০১৫-এর ডিসেম্বর মাসে স্বাক্ষরিত জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যারিস চুক্তিপত্রে। এগুলির মধ্যে রয়েছে :

(ক) আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা;

(খ) আপৎকালীন প্রস্তুতি;

(গ) যেসব ঘটনায় অনিবর্তনীয় ও স্থায়ী ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা সেগুলির জন্য প্রস্তুতি;

(ঘ) ঝুঁকিবিমার সুযোগ, জলবায়ুজনিত ঝুঁকির ক্ষেত্রে যৌথ প্রয়াস ও বিমা-নির্ভর মীমাংসা;

(ঙ) ঝুঁকির সুসংবদ্ধ যাচাই, মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা;

(চ) অর্থনীতি-বহির্ভূত ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ; এবং

(ছ) জনগোষ্ঠী, জীবন-জীবিকা ও বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিস্থাপকতা।

ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ

গত বছর যে তিনটি আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তার প্রতিটি চূড়ান্ত করার পেছনে ভারতের অবদান রয়েছে। ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ জনবহুল দেশ, অর্থনীতির মাপকাঠিতে বিশ্বে তার স্থান ষষ্ঠ এবং দ্রুততম বিকাশশীল দেশগুলির মধ্যেও সে অন্যতম। অন্যদিকে আবার এই ভারতেই রয়েছে বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক চরম দারিদ্র্যকবলিত মানুষ, অপুষ্টিপীড়িত শিশু এবং নিরক্ষর বয়স্কজন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে সুস্থায়ী উন্নয়ন ও বিপর্যয় স্থিতিস্থাপকতার আন্তর্জাতিক লক্ষ্যপূরণে ভারতের ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

নকশা-২ : বিপর্যয়ের প্রভাব (১৯৯৫-২০১৫)

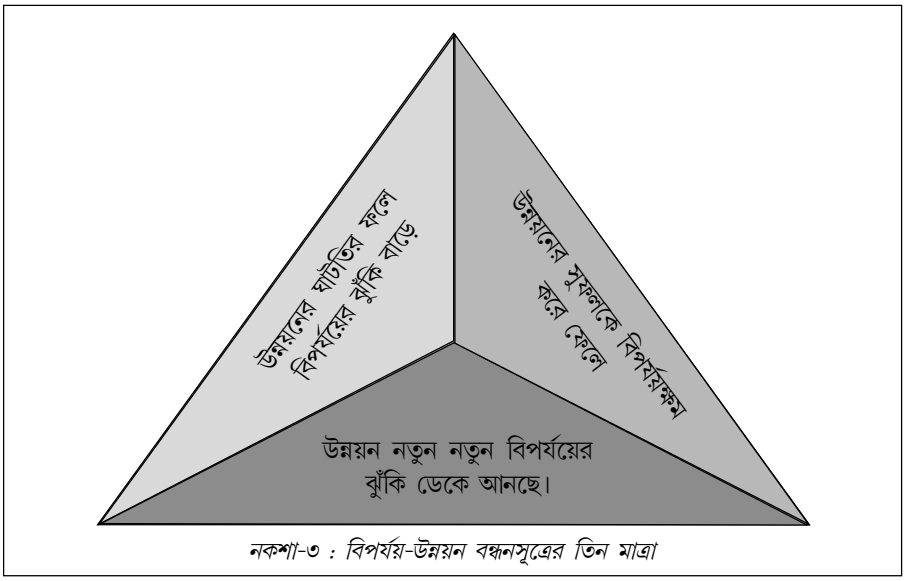

নকশা-৩ : বিপর্যয়-উন্নয়ন বন্ধনসূত্রের তিন মাত্রা

ভারতে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন স্তরে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা চালু হয়েছে। বিপর্যয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সক্ষমতার প্রয়োগ ঘটায় হ্রাস পেয়েছে জীবনহানির আশঙ্কা। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘূর্ণিঝড়ে (যেমন, ফাইলিন ও হুদহুদের ক্ষেত্রে) এসব ইতিবাচক ফলাফল লক্ষ্য করা গেছে। অবশ্য এটাও স্বীকার করতে হয় যে, বন্যা বা অকস্মাৎ প্রবল বৃষ্টিপাতের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে (উত্তরাখণ্ড, শ্রীনগর ও চেন্নাই) অথবা ধস নামার মতো ভূ-তাত্ত্বিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে (মালিন ও উত্তর সিকিম) সমমানের সাফল্য আসেনি। বেড়ে চলেছে কলকারখানা ও সড়ক দুর্ঘটনার মতো প্রযুক্তিগত বিপর্যয়, রয়েছে মহামারীর মতো জৈব বিপর্যয় ব্যাপ্তির আশঙ্কা, উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে জলসম্পদের হ্রাস-প্রাপ্তি ও দ্রুতপ্রসারী নগরায়ণজনিত ক্রমবর্দ্ধমান বায়ুদূষণের হেতু পরিবেশগত বিপর্যয়। ২০০১-এর কচ্ছ ভূমিকম্পের পর এ ধরনের পরিস্থিতির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ভারত ঠিক কতদূর দক্ষতা অর্জন করেছে তা বলা শক্ত। জনবহুল নগরাঞ্চলে বড়ো ধরনের ভূমিকম্প ঘটলে তার নিদারুণ পরিণতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা ইতোমধ্যেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয় ঝুঁকি প্রক্রিয়ার স্বরূপ সম্পর্কে ভারতের বৈজ্ঞানিক ও সুপ্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার যথেষ্ট সমৃদ্ধ। কিন্তু আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচিগুলির প্রণয়ন ও রূপায়ণে এসব জ্ঞানভাণ্ডারের যথাযথ প্রতিফলন ঘটছে না। এর ফলে ঝুঁকি হ্রাসের

"প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয় ঝুঁকি প্রক্রিয়ার স্বরূপ সম্পর্কে ভারতের বৈজ্ঞানিক ও সুপ্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার যথেষ্ট সমৃদ্ধ। কিন্তু আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচিগুলির প্রণয়ন ও রূপায়ণে এসব জ্ঞানভাণ্ডারের যথাযথ প্রতিফলন ঘটছে না। এর ফলে ঝুঁকি হ্রাসের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত সুফল পাওয়া দূরের কথা অনেক ক্ষেত্রে গৃহীত কর্মসূচির দ্বারাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নতুন নতুন বিপর্যয় ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে অথবা বিদ্যমান ঝুঁকিগুলি আরও অবনতির দিকে যাচ্ছে।"

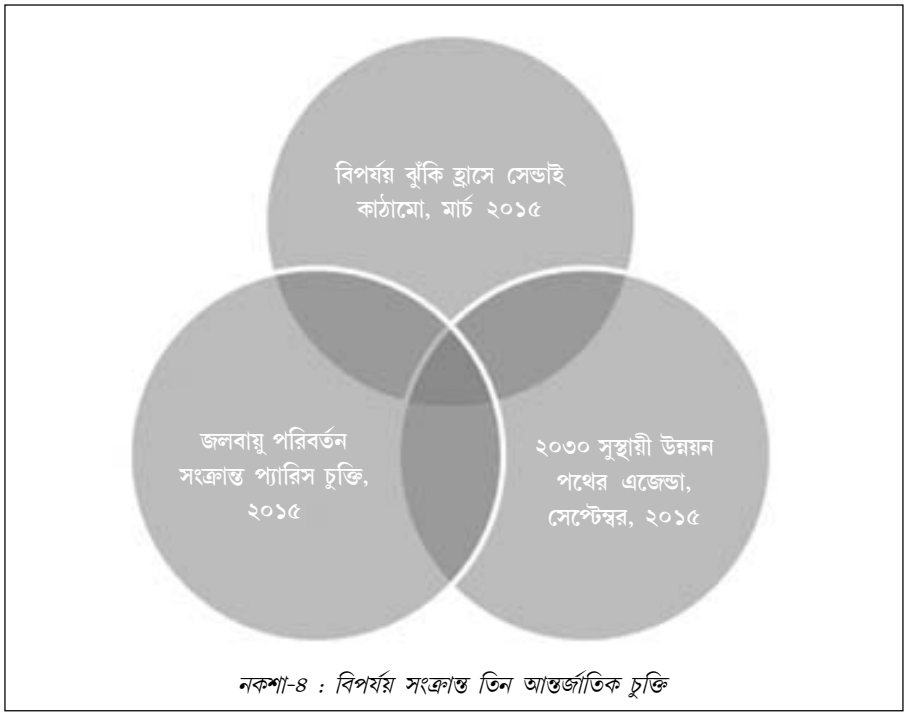

নকশা-৪ : বিপর্যয় সংক্রান্ত তিন আন্তর্জাতিক চুক্তি

ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত সুফল পাওয়া দূরের কথা অনেক ক্ষেত্রে গৃহীত কর্মসূচির দ্বারাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নতুন নতুন বিপর্যয় ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে অথবা বিদ্যমান ঝুঁকিগুলি আরও অবনতির দিকে যাচ্ছে।

দ্রুত অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যপথে ভারতের যাত্রা শুরু হয়েছে যা 'Make in India', 'Skill India', 'Digital India', স্বচ্ছ ভারত অভিযান, 'Smart Cities Mission' ইত্যাদি নতুন পদক্ষেপে আরও গতিশীল হয়ে উঠবে। অতিশয়োক্তি না করেও বলা যেতে পারে যে, আগামী দেড় দশকের মধ্যে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ দেশে যে পরিমাণ সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ ঘটবে তার পরিমাণ গত চার-পাঁচ দশকের হিসাবকে ছাড়িয়ে যাবে। এভাবেই বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়ন প্রকল্পগুলির পরিকল্পনা, নকশা প্রণয়ন ও রূপায়ণের যে সুযোগ এসেছে তাতে বিপর্যয় ঝুঁকি লাঘব করার বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে বলে আশা করা যেতেই পারে।

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার এজেন্ডায় কিছু দিন হল বলা হচ্ছে যে, মূলধারার উন্নয়নের প্রতিটি শাখায় ঝুঁকি হ্রাসের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হোক। তবে এ নিয়ে তেমন কোনও অগ্রগতি এখনও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তরের উদ্যোগে তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিপর্যয় স্থিতিস্থাপকতার কর্মপরিকল্পনা গড়ে তোলার প্রশ্নে সাধারণ বা সুনির্দিষ্ট কোনও প্রকার নির্দেশিকাই গ্রহণ করেনি। মনে রাখার দরকার এ বিষয়ে সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে সেন্ডাই কাঠামো ও প্যারিস জলবায়ু চুক্তি সমস্যা সমাধানের নতুন সুযোগ এনে দিয়েছে।❑

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস. আধিকারিক। সার্ক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের তিনি প্রথম অধিকর্তা। ইমেল : dharc@nic.in)

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী

'লেস ক্যাশ' অর্থনীতি

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা : প্রশিক্ষণ ও সামর্থ্যের পরিসর বৃদ্ধি

*বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমানোর ক্ষেত্রে সামর্থ্যের বিকাশ ঘটানো এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। বিপর্যয়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে, বিভিন্ন পর্যায়ে চিহ্নিত ঝুঁকির মোকাবিলা করতে 'সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক' জোর দেয় প্রতিষ্ঠান, সরকার ও জনগোষ্ঠীর প্রযুক্তিগত, আর্থিক ও প্রশাসনিক সামর্থ্য বৃদ্ধির উপর। ঝুঁকি কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে সামর্থ্যের পরিসর আরও ব্যাপকতর করার কথা বলা হয় এই ফ্রেমওয়ার্ক-এ। সাধারণত, সামর্থ্যের বিকাশ বলতে এমন এক প্রক্রিয়াকে বোঝায় যা বর্তমান 'সহায়সম্পদ' ও নিজস্ব শক্তির দ্বারা চালিত হয়। 'সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক' বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মহিলাদের 'সামর্থ্য বিকাশ'-এর প্রয়োজনীয়তা ও বিপর্যয়ের ঝুঁকির ব্যবস্থাপনায় তাদের কার্যকর ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। লিখেছেন—***আর. কে. জৈন*** *এবং* ***ভি. থিরুপ্পুকাস***

'সামর্থ্য' (Capacity) বলতে বোঝায় কোনও ব্যক্তিবিশেষ, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট/ব্যবস্থার কার্যকলাপ সঠিক তথা নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যাওয়া। এর আরেকটি অর্থ হল—"যে প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিবিশেষ, প্রতিষ্ঠান ও সমাজ সময়ের সাথে নিজেদের বিকাশের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়, সক্ষমতা বাড়িয়ে নেয় এবং তা ধরে রাখে"। সহজ কথায়, সামর্থ্য যদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও লক্ষ্যমাত্রা পূরণের একটা দিক হয়, তবে 'সামর্থ্যের বিকাশ' বা Capacity development হল তা অর্জনের উপায় (UNDP)। এর আওতায় পড়ছে সর্ব স্তরে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সামর্থ্য বৃদ্ধি, তা প্রতিষ্ঠানই হোক বা পদ্ধতি। রাষ্ট্রসংঘের বিপর্যয় হ্রাসের জন্য আন্তর্জাতিক স্ট্র্যাটেজি (United Nations International Strategy for Disaster Reduction—UNISDR) অনুযায়ী বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমানো (Disaster Risk Reduction—DRR)-এর জন্য সামর্থ্য বিকাশের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে :

"এক বৃহত্তর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে যে পদ্ধতিতে মানুষজন, প্রতিষ্ঠান ও সমাজ, সময়ের সঙ্গে নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণে নিরবচ্ছিন্নভাবে সামর্থ্যকে বাড়িয়ে চলে তাকেই আমরা 'সামর্থ্য বিকাশ'-এর তকমা দিতে পারি। এ কাজে সহায়ক হয় জ্ঞান, দক্ষতা, ব্যবস্থাপত্র এবং প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন।।" (United Nations, 2009)

বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমানোর ক্ষেত্রে সামর্থ্যের বিকাশ ঘটানো এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। বিপর্যয়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে, বিভিন্ন পর্যায়ে চিহ্নিত ঝুঁকির মোকাবিলা করতে 'সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক' জোর দেয় প্রতিষ্ঠান, সরকার ও জনগোষ্ঠীর প্রযুক্তিগত, আর্থিক ও প্রশাসনিক সামর্থ্য বৃদ্ধির উপর। ঝুঁকি কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে সামর্থ্যের পরিসর আরও ব্যাপকতর করার কথা বলা হয় এই ফ্রেমওয়ার্ক-এ। সাধারণত, সামর্থ্যের বিকাশ বলতে এমন এক প্রক্রিয়াকে বোঝায় যা বর্তমান 'সহায়সম্পদ' (Capacity assets) ও নিজস্ব শক্তির দ্বারা চালিত হয় (UNDP)। 'সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক' বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মহিলাদের 'সামর্থ্য বিকাশ'-এর প্রয়োজনীয়তা ও বিপর্যয়ের ঝুঁকির ব্যবস্থাপনায় তাদের কার্যকর ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ঝুঁকি কমানোর জন্য সামর্থ্য বিকাশ সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা বা Sustainable Development Goals (SGDs) অর্জন করার ক্ষেত্রেও অপরিহার্য।

সামর্থ্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তর ও প্রকার

সামর্থ্য বিকাশের তিনটি স্তর আছে : ব্যক্তিবিশেষ (Individual), প্রাতিষ্ঠানিক (Institutional/organisational) ও অনুকূল পারিপার্শ্বিক পরিবেশ (enabling environment)। নিয়ম-কানুন, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্ব, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, শক্তির সমীকরণ ও সামাজিক আচার সংক্রান্ত বিষয়সমূহ অনুকূল পারিপার্শ্বিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তিবিশেষ যাতে একসঙ্গে কাজ করে একটি সংগঠনের নিজস্ব কার্যসিদ্ধি ও লক্ষ্যপূরণে সক্ষম হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ নীতি, কাঠামো ব্যবস্থা ও কৌশল, প্রক্রিয়া প্রভৃতি উপাদানগুলি প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের অন্তর্গত। ব্যক্তিবিশেষ স্তর জনগোষ্ঠী বা দলভুক্ত বা একক মানুষের দক্ষতা ও জ্ঞান সংক্রান্ত (CDARi)।

সামর্থ্য বৃদ্ধির দু'টি পন্থা আছে—কার্যনির্বাহী (Functional capacity) ও কারিগরি (Technical capacity) একদিকে নীতি, কৌশল, যোজনা ও প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা করতে কার্যনির্বাহী সামর্থ্য আবশ্যক (UNDP 2008)। অন্যদিকে কারিগরি সামর্থ্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের নির্দিষ্ট প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত (CDARi)।

শুধু মানব সম্পদ উন্নয়নই একমাত্র লক্ষ্য নয়। ঝুঁকি প্রশমনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্যের উন্নতিসাধনের উপরও জোর দেওয়া হচ্ছে। তাই, সামর্থ্য গড়ে তোলা একা সরকারের দায়িত্ব নয়। আমাদের দরকার একটি সর্বজনীন (All-of-society) অভিমুখ—'সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক'-এর এই মন্তব্য যথার্থ। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে সরকারি প্রতিষ্ঠান, জনগোষ্ঠী, পেশাদার, বিশেষজ্ঞ, বেসরকারি ক্ষেত্র, অ-সরকারি সংস্থা ও অন্যান্য অ-সরকারি অংশীদারদের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

বর্তমানে সামর্থ্যের হালহকিকৎ, প্রয়োজন ও ব্যবধান সঠিকভাবে অনুধাবন করতে বিপর্যয়ের ঝুঁকি প্রশমনের জন্য সামর্থ্য বিকাশে সব অংশীদার, বিশেষত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা আবশ্যক। অর্থাৎ, উল্লিখিত বিভিন্ন স্তরে প্রথাগত সরকারি সূত্র ও অপ্রথাগত সংযোগসাধনের মাধ্যমে সামর্থ্যের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করতে হবে। আর এই প্রয়োজনের ভিত্তিতেই সামর্থ্য বৃদ্ধির প্রকল্পের রূপরেখা নির্ধারণ করতে হবে। সামর্থ্যের ব্যবধান চিহ্নিত করে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন অংশীদারদের ভূমিকা অনুসারে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি রূপায়ণ করতে হবে। শ্রেণিকক্ষে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি, প্রয়োজন অনুযায়ী হাতে-কলমেও শেখার প্রচুর সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে—যেমন, কর্মক্ষেত্রে শিক্ষানবিশি, নেটওয়ার্কিং (কাজের তাগিদে যোগাযোগ স্থাপন করা ও বজায় রাখা), Immersion ও Exchange কর্মসূচি, প্রথাগত শিক্ষার পাঠক্রম, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, অনুশীলন, যৌথ কর্মসূচি ইত্যাদি।

জাতীয় নীতি ও সামর্থ্য গড়ার জন্য পরিকল্পনা

ভারতে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় নীতিতে বিপর্যয় ঝুঁকি প্রশমনে সব অংশীদারদের সামর্থ্য বিকাশের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। জাতীয় নীতি "কার্যকরভাবে বিপর্যয় প্রতিরোধ ও বিপর্যয়-পরবর্তী কার্যকলাপ পরিচালন করার জন্য যথোপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, পরিচালন ব্যবস্থা ও সম্পদ বরাদ্দ করার ব্যবস্থা গড়ে তোলা"-কে সামর্থ্য বিকাশের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এই সূত্রের ভিত্তিতে, 'জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা যোজনা' বা National Disaster Management Plan (NDMP) ভারতে সামর্থ্য বিকাশকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছে; ঝুঁকি প্রশমনের জন্য প্রতিরোধ ও নিরসন, কার্যকরি প্রস্তুতি ও সাড়া এবং উদ্ধার ও আরও উন্নতমানের পুনর্গঠন। নির্দিষ্ট বিপত্তিভিত্তিক প্রয়োজন অনুযায়ী সামর্থ্য গড়ে তোলা, কোন অংশীদারের সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে হবে এবং কোন সংস্থা সামর্থ্য বিকাশের দায়িত্ব নেবে—পরিকল্পনায় এই সব বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে (বিস্তারিত তথ্য জানতে National Disaster Management Plant 2016 দেখুন)।

ভারতে সামর্থ্য বিকাশের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক দায়িত্ব রাজ্য সরকারের উপর বর্তায়। স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্রীয় সরকার সহায়তা প্রদান করে।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার কাঠামোটি এক রকম নয়। বেশিরভাগ রাজ্যেই সংশ্লিষ্ট সরকার 'রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ' স্থাপন করেছে; বিপর্যয়-পরবর্তী সাড়া ও উদ্ধারকার্যের দায়িত্ব মূলত উদ্ধারকার্য সংক্রান্ত কমিশনার (Commissioner of Relief)-এর উপর ন্যস্ত। অনেক রাজ্যই বিপর্যয়ে সাড়া দিতে বিশেষ বাহিনী (State Disaster Response Forces) গঠন করেছে; তবে, বেশ কিছু রাজ্য এখনও দমকল ও অগ্নি নির্বাপণ বিভাগের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। আবার, দমকল পরিষেবা একেক রাজ্যে একেক রকম। বেশির ভাগ রাজ্যে দমকল পরিষেবা কেন্দ্রীভূত ও সরাসরি রাজ্য সরকারের আওতাধীন; কিছু রাজ্যে অবশ্য তা পুর প্রশাসনের এক্তিয়ারভুক্ত। প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত পার্থক্যের জেরে সামর্থ্য বিকাশ ব্যবস্থাও বিভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ধরনের। গুজরাত ও ওড়িশার মতো কিছু রাজ্য শুধুমাত্র বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে বা করছে; বাকি রাজ্য মূলত এখনও তাদের প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি দিয়ে কাজ চালাচ্ছে।

রাজ্য সরকারগুলিকে সাহায্য করতে কেন্দ্র একাধিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। সামর্থ্য বিকাশের জন্য এগুলি বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রকের। বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সুরক্ষা বিষয়ক কমিটি (Cabinet Committee on Security—CCS) ও জাতীয় সঙ্কট ব্যবস্থাপনা কমিটি (National Crisis Management Committee—NCMC) নির্ণায়ক ভূমিকা নেয়।

২০০৫ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বাধীন 'জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ' (National Disaster Management Authority—NDMA) স্থাপিত হয়। নীতি-নির্ধারণকারী এই কেন্দ্রীয় সংস্থা ভারতে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করে বিপর্যয়-পরবর্তীকালে যথাসময়ে কার্যকরি সাড়া দেওয়া সুনিশ্চিত করে ও দীর্ঘমেয়াদে বিপর্যয় ঝুঁকি প্রশমন করে। এই কর্তৃপক্ষ সামর্থ্য বিকাশের দু'টি দিকের উপর বিশেষভাবে জোর দিচ্ছে—এক, অনুকূল পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সৃষ্টি এবং দুই, প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ আরও বেশি অনুকূল বানাতে 'জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ' নির্দিষ্ট বিপত্তিভিত্তিক নীতি-নির্দেশিকা ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। নির্দিষ্ট বিপত্তি চিহ্নিত করে 'জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা যোজনা' সেই অনুযায়ী সামর্থ্য গড়ে তুলতে একাধিক পন্থা সুপারিশ করেছে।

এর পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান ও জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য 'জাতীয় বিপর্যয় কর্তৃপক্ষ'

সরাসরি নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করছে—রাজ্য সরকারের সাড়া দেওয়ার সামর্থ্যের উন্নতিসাধনের লক্ষ্যে তারা জেলা, রাজ্য ও আঞ্চলিক স্তরে Mock drill ও অনুশীলনের ব্যবস্থা করে। ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকি নিরসনের বৃহত্তম প্রকল্প 'জাতীয় ঘূর্ণিঝড় ঝুঁকি নিরসন প্রকল্প' বাস্তবায়িত হচ্ছে। লক্ষ্য শুধুমাত্র সরকার নয়, জনগোষ্ঠী, বিশেষত মহিলাদের ক্ষমতায়ন। বলা যেতে পারে যে জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য এটি দেশের সব থেকে বড়ো কর্মসূচি। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হল 'জাতীয় স্কুল সুরক্ষা প্রকল্প'। এর উদ্দেশ্য ছাত্র-শিক্ষকদের সামর্থ্য গড়ে তুলে তাদের প্রস্তুতির মানোন্নয়ন। 'জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ' অন্যান্য মন্ত্রককেও বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিকল্পনা করতে পথনির্দেশ দেয়।

'জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ' প্রধানত প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধির উপর জোর দেয়। অন্যদিকে, 'জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট' (National Institute of Disaster Management—NIDM) প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে একটি জাতীয় স্তরের তথ্য-ভাণ্ডার গড়ে তোলে; অন্যান্য জ্ঞানভিত্তিক সংস্থার সঙ্গে তথ্যের আদান-প্রদান করে; এবং প্রশিক্ষক, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সামিল আধিকারিক ও অন্যান্য অংশীদারদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। 'জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট' বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে 'উৎকর্ষের কেন্দ্র' হিসেবে স্বীকৃত হ'তে সচেষ্ট। বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। 'জাতীয় বিপর্যয় মোচন বাহিনী (National Disaster Response Force—NDRF) জাতীয় স্তরের বাহিনী যার বিশেষত্ব তল্লাশি চালানো ও উদ্ধার করা। এই কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যের বাহিনীর পাশাপাশি জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান ছাড়া লাল বাহাদুর শাস্ত্রী প্রশাসন বিষয়ক জাতীয় অ্যাকাডেমি, ভারতীয় পুলিশ অ্যাকাডেমি ও জাতীয় স্তরের অন্যতম প্রতিষ্ঠানও বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার নানান দিক নিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

আগেই বলা হয়েছে, অনেক প্রতিষ্ঠান রাজ্য স্তরে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে ও সামর্থ্য বৃদ্ধি করছে। রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, পুলিশ অ্যাকাডেমি, গ্রামোন্নয়নের জন্য রাজ্যের প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় স্বশাসন বিষয়ক ইনস্টিটিউটও বিপর্যয় সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এই সব প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য জেলা, পুর প্রশাসন ও পঞ্চায়েত স্তরে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত আধিকারিক ও কর্মীদের সামর্থ্য বাড়ানো, বিশেষত তড়িঘড়ি হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

যবে থেকে মানুষ আছে, তবে থেকে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনাও আছে। মানুষ বিপর্যয়ের সঙ্গে মোকাবিলায় সফল হচ্ছে না অসফল, এই ইতিহাসই মানবজাতির ইতিবৃত্ত। শুধু ২০১৫ সালেই লিপিবদ্ধ ৩৪৬-টি বিপর্যয়ে ২২,৭৭৩ জন মারা যান এবং ৯ কোটি ৮৬ লক্ষ মানুষ প্রভাবিত হন। মোট আর্থিক ক্ষতি আনুমানিক ৬ কোটি ৬৫ লক্ষ মার্কিন ডলার (CERD 2016)। বিপর্যয়ে প্রাণহানির মাত্রা কমলেও আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির অঙ্কটা বেড়েই চলেছে। এর জন্য দায়ি দ্রুত নগরায়ন, অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাস, প্রযুক্তি-নির্ভর জীবনশৈলী, সরাসরি বিপর্যয় কবলিত নয় এমন অঞ্চলে প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক প্রভাব, জলবায়ু পরিবর্তন ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা (Coppola 2015)। তাই, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা সব প্রেক্ষিতে সকল অংশীদারদের, বিশেষত দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি কমানোর জন্য, সামর্থ্য গড়ে তোলাই সময়ের দাবি।

সব সময়েই প্রশমন হয় স্থানীয় স্তরে। বিপর্যয় প্রতিরোধ ও নিরসন সংক্রান্ত সবক'টি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি উদ্যোগ স্থানীয় স্বশাসনের সঙ্গে যুক্ত। যেমন, জমির ব্যবহার সংক্রান্ত পরিকল্পনা, নগরোন্নয়ন, পারিপার্শ্বিক এলাকায় নির্মাণের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা ও নির্মাণের নিয়ম-কানুন লাগু করা। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সঙ্কটের সময় এই স্থানীয় প্রশাসনই সবার আগে সাড়া দেয়। মানবসম্পদ, সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণের নিরিখে এদের সক্ষম করে তোলা আবশ্যক। স্থানীয় স্বশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতায়নের জন্যও সামর্থ্য বিকাশের প্রয়োজন আছে। পঞ্চায়েত ও পুর প্রশাসনের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তারা দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সঙ্কটের মোকাবিলা করতে পারেন, বিপর্যয়ের জন্য আগাম প্রস্তুতিতে যোগদান করতে পারেন, সতর্কবাতা পেয়ে তা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারেন, সহায়তা ও চিকিৎসা প্রদান উদ্যোগ, তল্লাশি চালানো বা উদ্ধারকার্য পরিচালনা করতে পারেন এবং ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন করতে পারেন। বিপর্যয়-পরবর্তীকালে সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য কী কী করা প্রয়োজন, সে বিষয়ে তার সম্যক ধারণা থাকা উচিত। বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার সর্বস্তরে স্থানীয় নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার সমগ্র পরিসরে স্থানীয় প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি, বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমানোর উপর গুরুত্ব আরোপ এবং জনজীবনের অঙ্গ হিসেবে সামগ্রিকভাবে বিপর্যয় প্রতিরোধ ও ঝুঁকি নিরসনের উদ্যোগ প্রসারিত করা (NDMP 2016)।

'জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা যোজনা'-য় জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণের উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। বিপর্যয় ঘটলে সর্বপ্রথম জনগোষ্ঠীই সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। তাই, এদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা সামর্থ্য বিকাশের প্রক্রিয়ার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। 'সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক'-এ সুশীল সমাজ, জনগোষ্ঠী ও স্বেচ্ছাসেবীদের বিপর্যয় ঝুঁকি কমানোর বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার প্রয়োজনের উল্লেখ আছে। জনগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ ও সদস্যদের সচেতনতা, সংবেদনশীলতা, প্রবৃত্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধি সামর্থ্য বিকাশ প্রক্রিয়ায় আওতাভুক্ত হওয়া উচিত। জাতীয় পরিকল্পনাতেও বিপর্যয় ঝুঁকি কমানোর জন্য সামর্থ্য বিকাশ করতে আগাম সতর্কবার্তা, যোগাযোগ, আপৎকালীন কর্মকাণ্ড পরিচালন

কেন্দ্র ও বিপর্যয় প্রশাসনের ক্ষমতা বৃদ্ধি-সহ একাধিক বিষয় উল্লিখিত হয়েছে এবং সেই সব পদক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানও চিহ্নিত করা আছে এতে।

যে কোনও ধরনের বিপর্যয়ের যে কোনও পর্যায়ে তল্লাশি ও উদ্ধারকার্য চালানোর সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে সরকার স্বেচ্ছাসেবী ও সুশীল সমাজকে স্বেচ্ছামূলক উদ্ধার ও অগ্নি-নির্বাপণ পরিষেবা প্রদান করতে উৎসাহিত করতে পারে। পাশ্চাত্যে এ ধরনের স্বেচ্ছামূলক অগ্নি-নির্বাপণ ব্যবস্থা প্রায়শই দেখা যায়। বন্যার সময় উদ্ধারকার্য চালানোর জন্য অনেক রাজ্য সরকারই ইতোমধ্যেই স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেছে। 'জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ'-ও স্বেচ্ছাসেবকদের বন্যা থেকে উদ্ধার করার প্রশিক্ষণ দিতে একটি নতুন প্রকল্প চালু করেছে। এর পাশাপাশি, বেসরকারি ক্ষেত্রেও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। যেমন, আপৎকালীন চিকিৎসা প্রদানের জন্য বেসরকারি ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের এবং বিপর্যয়ের মুখে সুস্থিত নির্মাণের জন্য ইঞ্জিনিয়ারদের। বেসরকারি সংগঠনের নিজেদের প্রয়োজনটুকুই শুধু নয়, পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকেও যাতে তারা প্রয়োজনে সাহায্য করতে পারে, সেই কথা মাথায় রেখে তাদের সামর্থ্য গড়ে তুলতে হবে। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে তড়িঘড়ি হস্তক্ষেপ, উদ্ধার এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনাকে মূলস্রোতে রাখতে অ-সরকারি সংগঠন ও সুশীল সমাজের সামর্থ্যও বাড়াতে হবে।

যথাযথভাবে সামর্থ্য বিকাশ করতে হলে স্থানীয় স্বায়ত্ত-প্রশাসন এবং উদ্ধার ও অগ্নি-নির্বাপণ পরিষেবার জন্য মানবসম্পদ ও সরঞ্জামের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

উপসংহার

সামর্থ্যের বিকাশ একটি এককালীন উদ্যোগ নয়। এটি এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। ঝুঁকির রকমফের অপ্রত্যাশিতভাবে বদলে যেতে পারে; তাই সামর্থ্য বিকাশের প্রকল্পগুলিকেও প্রগতিশীল বানাতে হবে। আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে এই দায়িত্ব সকল অংশীদারদের উপরই বর্তায়। সব অংশীদারের সামর্থ্যের সুস্থায়ী বিকাশের জন্য এক দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন। সামর্থ্য বিকাশের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন দেশি ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগও জরুরি। প্রাসঙ্গিকতা ও উপযোগিতা বজায় রাখতে সামর্থ্য বিকাশের পরিকল্পনা, প্রকল্প ও প্রশিক্ষণের লাগাতার পর্যালোচনা করতে হবে। প্রকল্পের ফল ও প্রভাবের মূল্যায়ন করে তা নথিভুক্ত করে রাখা উচিত। প্রতিবেদন প্রস্তুত করার সঙ্গে সঙ্গে গুণমান নিরবচ্ছিন্নভাবে সুনিশ্চিত করতে উদ্দীষ্ট, পৃথকীকৃত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে হবে। সূচকের মধ্যে রাখতে হবে সুবিধাভোগীদের জ্ঞান, মনোভাব ও আচরণে পরিবর্তন (IFRCRCS 2010)। একাধিক সমীক্ষায় উঠে এসেছে যে সামর্থ্য বিকাশে Top down model (বিকাশ প্রক্রিয়া সর্বপ্রথম উচ্চ-স্তরে শুরু হয়, পরে তার সুফল তৃণমূল-স্তরে পৌঁছায়) অনুসরণ করার ক্ষেত্রে নানা সমস্যা রয়েছে। তাই, ভবিষ্যতে সামর্থ্য বিকাশের উদ্যোগ হতে হবে আরও বেশি চাহিদাকেন্দ্রিক, জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন ও প্রেক্ষাপটভিত্তিক। সুস্থায়ীভাবে ঝুঁকি হ্রাস করতে গেলে এই উদ্যোগকে অংশগ্রহণমূলক বানাতে হবে এবং অংশীদারদের ক্ষমতায়ন করতে হবে। 'সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক' অনুযায়ী মহিলাদের সামর্থ্য বাড়ানোর উপর জোর দিতে হবে এবং জনসংখ্যার দুর্বল শ্রেণির সামর্থ্য বাড়িয়ে সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণকে পাখির চোখ করতে হবে। ফ্রেমওয়ার্ক-এ এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অতএব, যথাযথ ও সময়োপযোগী সামর্থ্য বিকাশ আমাদের এক সুস্থিত ভারত গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।❑

উল্লেখপঞ্জি :

- IFRCRCS (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies). *Building Capacity in Disaster Risk Management.* Geneva, Switzerland : IFRCRCS, 2010.
- CDARi. *Basics of Capacity Development for Disaster Risk Reduction,* n.d. http://www.rootchange.org/about_us/resources/publications/CADRI_brochure%20final.pdf (accessed 3rd December 2016).
- CERD, "2015 Disasters in Numbers" http://cred.be/sites/default/files/2015_DisastersInNumbers.pdf (accessed 1st December 2016).
- Coppola, Damon P. *Introduction to International Disaster Management.* Third ed. Oxford, UK : Elsevier Inc., 2015.
- NDMA (National Disaster Management Authority), *National Disaster Management Plan.* New Delhi : NDMA, 2016.
- UNDP. *Capacity Development Practice Note* : UNDP, 2008.
- UNDP. Capacity Development for Disaster Risk Reduction. (n.d.). file:///C:/Users/hppc/Desktop/Training%20and%20Capacity%20Development%20for%20DRR/5Disaster%20Risk%20Reduction%20-%20Capacity%20Development.pdf [accessed 3rd December 2016].
- United Nations. *2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction* Geneva, Switzerland: UNISDR, 2009.

(লেখক শ্রী জৈন বর্তমানে 'জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ' (NDMA)-এর সদস্য। ভারত সরকারের প্রাক্তন সচিব। ইমেল : secretary@ndma.gov.in। শ্রী থিরুপ্পুকাস নেপালে রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন জাতীয় পুনর্গঠন কর্তৃপক্ষ (UNDP—National Reconstruction Authority)-এর বরিষ্ঠ উপদেষ্টা। আগে গুজরাটের রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (GSDMA)-এর যুগ্ম মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক ছিলেন।)

রাসায়নিক বিপর্যয় : মোকাবিলা কোন পথে?

*আমাদের দেশে রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণের সঙ্গে যুক্ত শিল্পকারখানাগুলি বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত। উপরন্তু, আধুনিক প্রযুক্তির সাথে গাঁটছড়া বাঁধতে উদ্যোগের অভাব একান্ত। এই দুইয়ের যুগলবন্দীতে দেশের রাসায়নিক শিল্পক্ষেত্রে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দিন দিন বেড়ে চলেছে। যখন তখন ঘটতে পারে অগ্নিকাণ্ড, বিস্ফোরণ; নির্গত হতে পারে বিষাক্ত পদার্থ/গ্যাস। আলাদা আলাদাভাবে বা একসাথে এর মধ্যে যে কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে রাসায়নিক সামগ্রীর পরিবহণ, মজুত এবং প্রক্রিয়াকরণের সময়। বহু কার্যকারণ থাকতে পারে এমনটা ঘটে যাওয়ার পিছনে। লিখেছেন—*****এম. সূর্যনারায়ণন**

বর্তমানে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP)-এ ভারতীয় রসায়ন শিল্পক্ষেত্রের অবদান ২.১১ শতাংশ। গত পাঁচ বছরে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) ঘটেছে ১০.৪৯ বিলিয়ন ডলার। এই তথ্য দু'টি থেকেই দেশের রসায়ন শিল্পক্ষেত্রের কাজকর্মের পরিসর এবং সম্ভাবনার ছবিটা স্পষ্ট হয়। হিসাব করে দেখা গেছে, বার্ষিক ১১ শতাংশ হারে বেড়ে ২০২০ সাল নাগাদ ভারতীয় রসায়ন শিল্পক্ষেত্রের আয়তন দাঁড়াবে ১৫৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সম পরিমাণ। তবে, এই বৃদ্ধি অনেকাংশে ব্যাহত হচ্ছে সংশ্লিষ্ট শিল্পক্ষেত্রে সংঘটিত বড়ো মাপের বিপর্যয়ের প্যাঁচে পড়ে। অথচ এসব বিপর্যয় কিন্তু নিবারণ করা অসম্ভব নয়। যে কোনও রসায়ন শিল্পকারখানায় উৎপাদন প্রক্রিয়ার যে কোনও পর্যায়ে বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার ঝুঁকি থেকেই যায়। তা রাসায়নিক মজুত, উৎপাদন, রক্ষণাবেক্ষণের সময় যেমন, তেমনি বিলিব্যবস্থা বা পরিবহণের সময়ও। বিপজ্জনক রাসায়নিক অনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিবেশে ছড়িয়ে পড়লে অগ্নিকাণ্ড বা বিস্ফোরণ ঘটতে পারে; বিষাক্ত পদার্থ নিঃসরণ হতে পারে তা থেকে। এমনকী এই সব দুর্বিপাকের সব কয়টি এক সাথেই ঘটতে পারে। আবার যদি সংশ্লিষ্ট শিল্পকারখানা কোনও ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় গড়ে ওঠে বা কোনও শিল্পকারখানাকে কেন্দ্র করে আবাসিক কলোনির সংখ্যা দিন দিন বাড়তেই থাকে তবে সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক প্ল্যান্টে বড়ো মাপের দুর্ঘটনা ঘটলে মানুষ এবং পরিবেশের জন্য তা চরম বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। অগ্নিকাণ্ড এবং বিস্ফোরণের মতো বিপদের পাশাপাশি বিষাক্ত রাসায়নিক নিঃসরণের হেতু অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, যার রেশ মানুষ এবং পরিবেশের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদে রয়ে যেতে পারে।

উন্নত পশ্চিমী দেশগুলিতে এ ধরনের কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে বিশেষ পেশাদার 'দুর্ঘটনা তদন্তকারী সংস্থা' তার কারণ অনুসন্ধান করে। সুনির্দিষ্টভাবে রাসায়নিক দুর্ঘটনার তথ্য ভিত্তি (Data base) তৈরি করা হয়। ফলত, অতীতে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাগুলি থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করে, আবার যেন একই বিপর্যয় না ঘটে সেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার অবকাশ থাকে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হল ভারতে এ ধরনের সংস্থা এবং তথ্যভিত্তি দুয়েরই নিতান্ত অভাব। সাধারণভাবে অনেকগুলি গুরুতর কার্যকারণের সমন্বিত ব্যর্থতার ফলস্বরূপই শেষমেষ ঘটে যায় রাসায়নিক বিপর্যয়। আমাদের জেনেবুঝে নিতে হবে এর মধ্যে কোন ব্যর্থতাগুলি আদতে এই বিপর্যয়ের মূল হোতা এবং কোনগুলি নয়।

রাসায়নিক বিপর্যয়ের ব্যবস্থাপনার বিষয়টি দেখভাল করার জন্য আমাদের দেশে সঞ্চালক মন্ত্রক (Nodal Ministry) হল বন ও পরিবেশ মন্ত্রক (MoEF)। আর বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করতে বিভিন্ন মন্ত্রক, বিভাগ এবং রাজ্য কর্তৃপক্ষকে দিশা নির্দেশ করতে 'জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ' (National Disaster Management Authority—NDMA) প্রণয়ন করেছে নির্দেশিকা। ১৯৮৪ সালের ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার পর থেকে শিল্পকারখানার নিরাপত্তার বিষয়ে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার পর হস্তক্ষেপের পরিবর্তে বিপর্যয় যাতে না ঘটে সেই ধরনের নিরাপত্তার আবহের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য মূলত তিনটি বিষয়ের আলোচনা। কী কী কারণে রাসায়নিক বিপর্যয় ঘটে থাকে সেই সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করা। কীভাবে এই বিপর্যয় এড়ানো যেত তার আলোচনা এবং সত্যিই যদি বিপর্যয় ঘটে যায়, তার পরের করণীয়।

★ ★ ★ ★ ★

আমাদের দেশে রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণের সঙ্গে যুক্ত শিল্পকারখানাগুলি বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত। উপরন্তু, আধুনিক প্রযুক্তির সাথে গাঁটছড়া বাঁধতে উদ্যোগের অভাব একান্ত। এই দুইয়ের যুগলবন্দীতে দেশের রাসায়নিক শিল্পক্ষেত্রে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দিন দিন বেড়ে চলেছে। যখন তখন ঘটতে পারে অগ্নিকাণ্ড, বিস্ফোরণ; নির্গত হতে পারে বিষাক্ত পদার্থ/গ্যাস। আলাদা আলাদাভাবে বা একসাথে এর মধ্যে যে কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে রাসায়নিক সামগ্রীর পরিবহণ, মজুত এবং প্রক্রিয়াকরণের সময়। বহু কার্যকারণ থাকতে পারে এমনটা ঘটে যাওয়ার পিছনে। নির্দিষ্ট চাপ ও তাপমাত্রার হেরফের;

'Runaway reaction' (অর্থাৎ, রাসায়নিক বিক্রিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে ব্যর্থ হলে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়—বিক্রিয়া আপনা-আপনি ঘটে যেতে থাকে), বিপরীত চরিত্র বৈশিষ্ট্যের রাসায়নিক সামগ্রী মিশিয়ে ফেললে, রাসায়নিক রিঅ্যাক্টর-মজুত করার কন্টেনার-পাইপলাইন ইত্যাদিতে হঠাৎ করে ফুঁটোফাটা হয়ে গেলে, হার্ডওয়্যার ব্যবস্থা সঠিকভাবে কাজ না করলে, বিবিধ রাসায়নিক সঠিক পরিমাণে না মেশানোর দরুণ কাঙ্ক্ষিত বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ঘটলে, রিঅ্যাক্টর-এর নির্গমন মুখগুলির নক্শা নির্মাণে ত্রুটি, প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে কী ধরনের বিপদ ঘটার সম্ভাবনা থাকছে তার বিচার-বিশ্লেষণে খামতি ইত্যাদি। রাসায়নিক শিল্পক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় অগ্নিকাণ্ড ও বিস্ফোরণ ঘটার পেছনে হেতু হিসাবে নাম উঠে আসে জৈব দ্রাবকের। অগ্নিকাণ্ড এবং বিস্ফোরণের মধ্যে মূল তফাৎটা হচ্ছে শক্তি নিঃসরণের হারের নিরিখে। অগ্নিকাণ্ডের ফলে শক্তি নিঃসৃত হয় ধীরে ধীরে এবং বিস্ফোরণের ফলে দ্রুত হারে, বলা যেতে পারে সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যে। অবশ্য বিস্ফোরণের কারণেও আগুন ধরে যেতে পারে; ঠিক যেমনটি অগ্নিকাণ্ডের থেকেও ঘটতে পারে বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের তীব্রতা নির্ভর করে বিভিন্ন কারণের উপর এবং এই বিস্ফোরণকে দু' শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—উচ্চ শব্দে বিস্ফোরণ (Detonation) এবং আকস্মিক দহন (Deflagration)। অবরুদ্ধ বিস্ফোরণের কারণে বিস্ফোরণ স্থলে উপস্থিত মানুষজন হতাহত হন এবং সংশ্লিষ্ট স্থলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটে। অন্যদিকে, দাহ্য গ্যাস বা তরলের মজুত ভাণ্ডার সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাব হেতু সাধারণত আরেক ধরনের ব্যাপকতর নিয়ন্ত্রণহীন বিস্ফোরণের (Unconfined explosions) ঘটনা ঘটে। উল্লিখিত দাহ্য গ্যাস/তরল বাতাসের সাথে মিশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং কোনও ধরনের জ্বলন্ত উৎসের সংস্পর্শে এলে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। সুতরাং, এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দাহ্য গ্যাস/তরলের নিঃসরণের উৎস স্থান থেকে বহু দূরেও ক্ষয়ক্ষতি কারণ থাকছে এবং একে বলা হয় UCVE (Unconfined Vapour Cloud Explosions), বাংলায় বলা যেতে পারে অনবরুদ্ধ বাষ্প মেঘ বিস্ফোরণ। কঠিন রাসায়নিক চূর্ণ কোনও জ্বলন্ত উৎসের সংস্পর্শে এলে (রাসায়নিক) ধূলিকণার বিস্ফোরণের মাধ্যমে আবারও বিপুল পরিমাণ শক্তির নিঃসরণ হয়। প্রায়শই, অগ্নিকাণ্ড এবং বিস্ফোরণের সূত্রে পরিবেশে বিষাক্ত পদার্থ নিঃসরণের ঘটনা ঘটে। গ্যাস, তরল এবং কঠিন চূর্ণ—এই সব অবস্থাতেই যদি অদাহ্য রাসায়নিকের সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থায় গাফিলতি থেকে যায় তবে পরিবেশে বিষাক্ত পদার্থের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

"পশ্চিমী দেশগুলিতে এ ধরনের কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে বিশেষ পেশাদার 'দুর্ঘটনা তদন্তকারী সংস্থা' তার কারণ অনুসন্ধান করে। সুনির্দিষ্টভাবে রাসায়নিক দুর্ঘটনার তথ্য ভিত্তি (Data base) তৈরি করা হয়। ফলত, অতীতে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাগুলি থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করে, আবার যেন একই বিপর্যয় না ঘটে সেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার অবকাশ থাকে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হল ভারতে এ ধরনের সংস্থা এবং তথ্যভিত্তি দুয়েরই নিতান্ত অভাব। সাধারণভাবে অনেকগুলি গুরুতর কার্যকারণের সমন্বিত ব্যর্থতার ফলস্বরূপই শেষমেষ ঘটে যায় রাসায়নিক বিপর্যয়।"

প্রক্রিয়াকরণ/উৎপাদন প্রক্রিয়া চলাকালীন সংশ্লিষ্ট ইউনিট)/যন্ত্রপাতি/মেশিনারি ইত্যাদি চালানো/নাড়াচাড়ার সঠিক পন্থাপদ্ধতি এবং কী ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার, সেই নিয়মাবলী (Standard Operating Procedures—SoPs) কোম্পানিগুলি নির্দিষ্ট জায়গায় টাঙিয়ে রাখে। কিন্তু সেগুলি পালন করার ক্ষেত্রে মানুষের উদাসীনতার মতো ত্রুটির ফলস্বরূপই শিল্পকারখানায় দুর্ঘটনাগুলির সিংহভাগ ঘটে থাকে। কীভাবে মানুষের ভুলের কারণে রাসায়নিক বিপর্যয়ের দিকে ঘটনাচক্র গড়িয়ে যায় তার এক সার্থক উদাহরণ হল 'Piper Alpha' দুর্ঘটনা। এখানে মেরামতির কাজ চলছিল এমন একটি পাম্পকে যথাযথ জায়গায় নিরাপত্তা ভালভ্ লাগানো নয় এমন অবস্থাতেই একজন কর্মচারী ভুলবশত চালু করে দেওয়ার কারণে গ্যাস বেরোতে থাকে এবং তার ফলস্বরূপ শেষমেষ ঘটে বিস্ফোরণ।

বিভিন্ন শিল্পকারখানার ইউনিটের যন্ত্রাদিতে নক্শাগত ত্রুটির কারণেও রাসায়নিক বিপর্যয় ঘটতে পারে। যথাযথ স্থানে 'SoP' সংরক্ষিত না থাকলে উৎপাদন প্রক্রিয়া চলাকালীন যন্ত্রপাতিতে কোনও গোলযোগ দেখা দিলে প্রাথমিকভাবে যেসব সতর্কতা অবলম্বন করলে বিপর্যয়ের অভিঘাত কমানো সম্ভব সেই সুযোগ কাজে লাগানোর অবকাশ থাকে না। রাসায়নিক বিপর্যয়ের আর একটি বড়ো কারণ হল সংশ্লিষ্ট কোম্পানির বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব।

এসবের পাশাপাশি জঙ্গি কার্যকলাপ এবং অন্তর্ঘাতের কারণে রাসায়নিক শিল্পক্ষেত্রে বিপর্যয়ের আশঙ্কা দিন দিন বাড়ছে। বন্যা এবং ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও রাসায়ানিক শিল্পক্ষেত্রে বড়োসড়ো বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। সচরাচর আর যেসব কারণের ফলস্বরূপ রাসায়নিক বিপর্যয় ঘটে থাকে তার মধ্যে অন্যতম হল যন্ত্রপাতির ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণের অভাব। সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির উৎপাদকদের পরামর্শ অনুসরণে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে করে যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক কাজ করার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় এবং সুরক্ষার প্রশ্নটিও মাথাব্যথার কারণ হয়ে ওঠে না। কোনও একটা ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশও যদি সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা না হয় তবে তা

কাজের সময় গড়বড় করতে পারে এবং শেষমেশ বসে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। 'FLIX-BOROUGH' কাণ্ড এর পয়লা সারির উদাহরণ। যেখানে যন্ত্রপাতির ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে দুর্ঘটনার দরুন ২৪ জন মানুষের মৃত্যু হয় এবং বহুলোক আহত হন।

বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ পরিবহণের সময় দুর্ঘটনা ঘটলে তার ভয়াবহতা অনেকাংশে কমানো যায় যদি আপৎকালীন ভিত্তিতে তার মোকাবিলায় হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয়। তবে সে জন্য যে ধরনের পেশাদার দক্ষতাসম্পন্ন বাহিনী থাকা দরকার, আমাদের দেশে তার নিতান্ত অভাব থাকায় ভারতে বহু জায়গায় বড়োসড়ো রাসায়নিক বিপর্যয় ঘটে গেছে। বিপজ্জনক বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং তার সঠিক ব্যবস্থাপনার দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া দরকার। কারণ, এই পর্যায়েও অগ্নিকাণ্ড, বিস্ফোরণ এবং পরিবেশে বিষাক্ত পদার্থ নিঃসরণের মতো ঘটনা ঘটতে পারে।

✶ ✶ ✶ ✶ ✶

রাসায়নিক দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে একটা কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার পরে হস্তক্ষেপের পরিবর্তে তা যাতে আদপে না ঘটে সেজন্য নিবারণমূলক ব্যবস্থাপত্রের দিকে আগেভাগে নজর দিলে কাজের কাজ হয়। এজন্য সংশ্লিষ্ট শিল্পক্ষেত্রের যেমন দায়দায়িত্ব আছে, তেমনি সরকারের তরফেও অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। জনসাধারণেরও কিন্তু কিছু ভূমিকা থাকে এব্যাপারে। সংশ্লিষ্ট এই তিন পক্ষের ভূমিকা এবং দায়দায়িত্বের বিষয়ে এখানে উল্লেখ করা হল।

শিল্পক্ষেত্রে ভূমিকা

● **বিপজ্জনক কাজকর্মের পরিসর চিহ্নিত করা :**

☐ শিল্পকারখানা চালনার নিরাপত্তাজনিত দিকগুলি সম্পর্কে যদি যথাযথ জ্ঞান থাকে তবে দুর্ঘটনা নিবারণ ও তার উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সম্ভব হয়।

☐ নিত্যদিনকার কাজকর্মের ক্ষেত্রে কী ধরনের বিপদ যা ঝুঁকি তৈরি হতে পারে তা ঠিকমতো বুঝতে পারার মতো জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং আন্তরিকতাসম্পন্ন সুদক্ষ পেশাদার বাহিনী থাকা খুবই জরুরি। বিপদকে চিহ্নিত করার জন্য যথাযথ হাতিয়ারের ব্যবহার বেশ গুরুত্বপূর্ণ; কারণ তা বিপদের তীব্রতা কমাতে সাহায্য করে। এই সব ব্যবস্থাপত্র বা হাতিয়ারের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য কয়েকটি হল 'Checklists analysis', 'Safety audit', HAZOP, FTA/ETA, FMEA, LOPA ইত্যাদি।

কোনও চালু প্রকল্পে কী ধরনের ঝুঁকি রয়েছে তার ধারণা পাওয়া যায় Checklist বা যাচাই তালিকা বিশ্লেষণের মাধ্যমে। একই ধরনের পূর্ববর্তী প্রকল্পসমূহ, পুরোনো নথিপত্র এবং অন্যান্য সূত্র থেকে এই তালিকা প্রস্তুত করা হয়। 'Safety audit' বা 'নিরাপত্তা নিরীক্ষা' বলতে বোঝায় এক বিশেষ সংগঠিত রীতি প্রক্রিয়া অনুযায়ী কোনও কোম্পানির সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মকুশলতা, কার্যকারিতা এবং নির্ভরযোগ্যতা বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ করা।

☐ উপরিলিখিত বিভিন্ন ব্যবস্থাপত্রের ভিত্তিতে সুরক্ষা নিয়ন্ত্রণের এক যথাযথ ক্রমসূচি প্রস্তুত ও কার্যকর করলে রাসায়নিক বিপর্যয়ের নিবারণ কতকটা সুনিশ্চিত করা যায়। এর মধ্যে পড়ছে বিপদ ডেকে আনতে পারে তেমন কাজকর্ম এড়িয়ে চলা, তুলনামূলকভাবে বেশি নিরাপদ রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার, গোলযোগের কারণ হতে পারে এমন সব কাজকর্মকে উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং প্রযুক্তিগত নিয়ন্ত্রণের বন্দোবস্ত।

● **রাসায়নিক শিল্প কারখানায় বিবিধ সুযোগ-সুবিধা এবং যন্ত্রাদির রক্ষণাবেক্ষণ :**

☐ নির্দিষ্ট সময় অন্তর যাবতীয় যন্ত্রপাতি এবং মেশিনপত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যথাযথ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ।

☐ শিল্পকারখানায় নিরাপত্তাজনিত যেসব বন্দোবস্ত থাকে তা ঠিকমতো কাজ করছে কি না তথা কারখানায় যাবতীয় যন্ত্রপাতি অভিপ্রেত পদ্ধতিতে অপারেট করা হচ্ছে কি না—এই দু'টি বিষয় সুনিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত কারখানা স্থলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করা উচিত।

● **বাষ্প/গ্যাস নিঃসরণের ঘটনা তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলার মতো ব্যবস্থা চালু করা :**

☐ শিল্পকারখানায় যদি হঠাৎ করে বাষ্প/গ্যাস নিঃসৃত হতে থাকে, এমনকী খুব সূক্ষ্ম কোনও ছিদ্রের মাধ্যমেও, তবে তা তৎক্ষণাৎ যাতে নজরে আসে তথা এমন ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে বিপদসংকেত সূচক ঘণ্টি বেজে ওঠে, সে ধরনের বন্দোবস্ত চালু রাখতে হবে। ফলে দ্রুত ছিদ্র মেরামতির মাধ্যমে বড়োমাপের বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

● **চালু নিয়মাবলি ও নিয়ন্ত্রণ বিধি পালন :**

☐ শিল্পকারখানার কাজকর্ম সুস্থায়ীভাবে এবং নিরাপদ প্রক্রিয়ায় চালিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ্য সরকারগুলি এবং কেন্দ্রের আরোপ করা বিবিধ আইন-কানুন, নিয়মাবলি ও নিয়ন্ত্রণ বিধি কঠোরভাবে মেনে চলা উচিত।

● **মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার বিকাশ :**

☐ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বেশ জটিল বিষয়। এজন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে নজরদারি চালিয়ে যাওয়া জরুরি। পাশাপাশি, ব্যক্তিবিশেষের অভ্যাস ও স্বভাব-চরিত্রের উপর ভিত্তি করে বিবিধ সুরক্ষা কর্মসূচি রূপায়ণ করা উচিত।

☐ রাসায়নিক শিল্পে নিরাপত্তা ব্যবস্থার মানোন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্পকে অবশ্যই এক উত্তম মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে, যার পরিসর শীর্ষস্থানীয় আধিকারিক পর্যন্ত বিস্তৃত।

☐ সংস্থার শীর্ষস্থানীয় পরিচালকবর্গ এবং কর্মীদের পরস্পরের মধ্যে মসৃণভাবে কথাবার্তা/ভাব বিনিময়ের উপযুক্ত এক সহজ পরিবেশ বজায় রাখাটা জরুরি। ফলে, সংশ্লিষ্ট কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ার গুণমানের সঙ্গে কোনওভাবে আপোষ করা হচ্ছে কি না বা গোলযোগের কোনও সম্ভাবনা আছে কি না সেসব খবরাখবর শ্রমিক-কর্মীরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরে আনতে ইতস্তত করবেন না।

● **আপৎকালীন প্রস্তুতি :**

☐ আপৎকালীন ভিত্তিতে দ্রুত পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে যথাযথভাবে হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম এক দক্ষ বাহিনী শিল্পকারখানায় হাজির রাখতে হবে। ফলে বিপর্যয় সৃষ্টির সম্ভাবনাকে অনেকটা কমিয়ে আনা যাবে।

☐ মাঝে মাঝেই আপৎকালীন পরিস্থিতির কৃত্রিম মহড়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। যাতে

করে এই পরিস্থিতিতে কীভাবে কী করণীয় সে সম্পর্কে শ্রমিক-কর্মীরা যথেষ্ট সচেতন হয়ে ওঠেন।

সরকারের ভূমিকা

● **দুর্ঘটনা অনুসন্ধান পর্ষদ গঠন এবং রাসায়নিক দুর্ঘটনার তথ্যভিত্তি প্রস্তুতি :**

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাসায়নিক নিরাপত্তা পর্ষদ (Chemical Safety Board)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে ভারতে একটি দুর্ঘটনা অনুসন্ধান পর্ষদ (Accident Investigation Board) গঠন করা যেতে পারে। এই পর্ষদের কাজ হবে রাসায়নিক বিপর্যয়ের তদন্ত করা এবং প্রতিটি দুর্ঘটনা থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিয়ে তার ভিত্তিতে এক নির্দেশিকা তৈরি। তার ফলে বারংবার একই ধরনের বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটার হাত থেকে নিস্তার পেতে সাহায্য মিলবে। দুর্ঘটনার খবরাখবর গোচরে আনার ব্যবস্থা (Accident Reporting System) গড়ে তোলার জন্যও একই রকম উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক দুর্ঘটনা কাণ্ড সংক্রান্ত তথ্যভিত্তি (Database) প্রস্তুত করাটাও অপরিহার্য। এ সংক্রান্ত এক 'Online portal' তৈরি করা গেলে রাসায়নিক শিল্পক্ষেত্রে বহু ধরনের ঝুঁকি মোকাবিলায় গোটা বিশ্বের বিশেষজ্ঞদের থেকে পরামর্শ/সুপারিশ মেলার অবকাশ তৈরি হবে। ফলত, কারখানার কার্যপ্রণালীতে অদৃষ্টপূর্ব কোনও পরিস্থিতি দেখা দিলে তা নিবারণে সাহায্য মিলবে।

● **সচেতনতা প্রচারাভিযান :**

কোনও রাসায়নিক বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটে গেলে তা থেকে সংশ্লিষ্ট কারখানার শ্রমিক-কর্মী তথা জনসাধারণের কী ধরনের বিপদের সম্ভাবনা থাকছে, সে বিষয়ে সরকার সচেতনতা জোগাতে পারে। এই বিপদ সম্পর্কে শ্রমিক-কর্মীদের নিজেদের যদি সঠিক ধ্যানধারণা থাকে তবে তারা নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন কাজকর্ম থেকে বিরত থাকবেন। তথা সত্যি যদি বিপর্যয় ঘটে যায় তবে তার মোকাবিলাও সঠিক পদ্ধতিতে করতে সক্ষম হবেন।

● **গবেষণা ও বিকাশ :**

রাসায়নিক শিল্পক্ষেত্রের উপজাত পদার্থগুলির মধ্যে বিষাক্ততার মাত্রা হ্রাস করতে সক্ষম নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনার জন্য সরকারকে গবেষণা ও বিকাশ কর্মকাণ্ড চালাতে উদ্যোগী হতে হবে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার এমন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবনার লক্ষ্যে গবেষণা চালাতে হবে, যাতে করে উৎপাদিত পণ্যে বিষাক্ততার মাত্রা যথাসম্ভব কমিয়ে আনা যায়। ফলত, যদি দুর্ঘটনা ঘটেও যায় তা হলেও ক্ষতির মাত্রা যথেষ্ট পরিমাণে কমানো সম্ভব হবে।

● **শিল্পকারখানার চৌহদ্দির বাইরে আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি :**

কোনও বড়ো মাপের দুর্ঘটনা ঘটে গেলে পরিবেশ এবং দুর্ঘটনাস্থলের আশপাশের মানুষজনের উপর তার ব্যাপক প্রভাব পড়ে। এই প্রভাবের অভিঘাত কমাতে স্থানীয় প্রশাসন/কর্তৃপক্ষ নিজেদের কর্তব্যকর্ম ঠিকমতো পালন করছে কি না তা সুনিশ্চিত করাই এই ধরনের আপৎকালীন পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। আমাদের চালু নিয়মবিধি এবং নিয়ন্ত্রণবিধি অনুযায়ী এই পরিকল্পনা অনুশীলন চালিয়ে যেতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিপদ-আপদ ও তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমজনতার মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যাতে করে বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার পর মোকাবিলা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে জনসাধারণের তরফেও সহায়তার হাত এগিয়ে আসে।

● **বিপজ্জনক রাসায়নিকের পরিবহণ :**

বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ পরিবহণের সময় দুর্ঘটনা ঘটে গেলে দ্রুত তথা সময়মতো আপৎকালীন হস্তক্ষেপের বন্দোবস্ত দুর্ঘটনার অভিঘাত কমাতে এবং দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের উদ্ধারে অত্যন্ত কাজে আসে। সম্প্রতি ভারতীয় রসায়ন পরিষদ (Indian Chemical Council—ICC) 'Nicerglobe' (nicerglobe.in)—বাংলায় 'সুন্দরতর বিশ্ব' বলা যেতে পারে—নামে একটি কর্মসূচি চালু করেছে। এই ব্যবস্থায় রাসায়নিক পরিবহণের কাজে নিয়োজিত ট্রাকগুলিকে রওনা হওয়ার সময় থেকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো পর্যন্ত GPRS ট্র্যাকিং-এর আওতায় রাখার পরিষেবা দেওয়া হয়। 'Nicerglobe' মঞ্চ আপৎকালীন ভিত্তিতে হস্তক্ষেপের বন্দোবস্ত করতে সক্ষম বাহিনীর সঙ্গে সুন্দরভাবে যোগাযোগ রেখে চলে। নিজেদের বিপজ্জনক পণ্য পরিবহণের সময় নিরাপত্তার খাতিরে রাসায়নিক কোম্পানিগুলিকে ভারতীয় রসায়ন পরিষদের এই উদ্যোগে যুক্ত হতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

জনসাধারণের ভূমিকা

☐ যে কোনও ধরনের রাসায়নিক দুর্ঘটনার সঙ্গে কী কী ঝুঁকি জড়িত থাকে, সে বিষয়ে আমজনতার মধ্যে যদি এক সাধারণ সচেতনতা থাকে তবে তা দুর্ঘটনার প্রভাব হ্রাসে সহায়ক হয়।

☐ যে কোনও বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটলে সাধারণ মানুষকে তার মোকাবিলায় সংঘবদ্ধ করতে একটি পারস্পরিক সহায়ক গোষ্ঠী গঠন করা যেতে পারে। কোনও রাসায়নিক (পদার্থ) দুর্ঘটনাবশত পরিবেশে ছড়িয়ে পড়লে কী করা উচিত আর কী উচিত নয়—সে ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার।

★ ★ ★ ★ ★

পরিশেষে বলা যায়, রাসায়নিক শিল্পক্ষেত্রে বিপর্যয় যথেষ্ট বিরল। কিন্তু অসাবধনতা বা দুর্ভাগ্যের কারণে খুব সহজেই বিধ্বংসী রূপ নিতে পারে এই ধরনের বিপর্যয়। কোনও বড়ো মাপের দুর্ঘটনা ঘটলে তাকে ঘিরে তৎক্ষণাৎ বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটে। জীবনহানি, পরিবেশের অবক্ষয়ের আশঙ্কা, সংশ্লিষ্ট শিল্পকারখানা ধ্বংস ও তার আশপাশের ঘর-বাড়ির বড়ো মাপের ক্ষতি ইত্যাদি। তবে তার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট শিল্পক্ষেত্রের (নিরাপত্তাজনিত) সুনামের উপর যে আঘাত নেমে আসে সেই ক্ষতি পূরণ প্রায় অসাধ্য। কোনও রাসায়নিক বিপর্যয়ের ফলস্বরূপ তার বিরূপ প্রভাব জনসংখ্যার মধ্যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যায় এবং এই প্রভাবের থেকে পরিত্রাণ পাওয়া কার্যত অসম্ভব। এজন্য রাসায়নিক বিপর্যয় পীড়িত মানুষজনকে যে মূল্য চোকাতে হয় তা এককথায় অচিন্তনীয়।❑

(লেখক চেন্নাইস্থিত 'কেন্দ্রীয় চর্ম গবেষণা প্রতিষ্ঠান' (CLRI)-এর 'রসায়ন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ'-এর সঙ্গে যুক্ত। ইমেল : msuril@vsnl.com)

WBCS প্রস্তুতির ১ নম্বর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

1st Executive
WBCS - 2015

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সাহায্য ছাড়া এই সাফল্য সম্ভব ছিল না

ডব্লুবিসিএস পরীক্ষার সিলেবাসটি সমুদ্রের মত । এই পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কি পড়ব এবং কতটা পড়ব এই বিষয়টি জানা। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এখানে নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখেছে। এখানকার স্যারদের পরামর্শে বিষয়টি হয়ে উঠেছে জলবৎ।

সৌভিক ঘোষ, Executive (Rank-1), WBCS - 2015

1st CTO
WBCS - 2015

ACADEMIC's hand of co-operation helped me to achieve the ultimate goal.

This long journey was quite difficult without the help of Academic Association which is the pioneer Institution for many WBCS aspirants like me. Their valuable study materials, Mock Interview classes, guidance and hand of Co-operation helped me to overcome the hurdles & to achieve the ultimate goal.

-Moumita Sengupta, CTO (Rank-1), WBCS - 2015

Association helped me immensely in shaping my views

Every exam requires certain orientation that sailed us towards it and for WBCS it is proper strategy and dedication with adequate amount of perseverance. To complete the journey you need to pass through an interview process and this was where I was very much tensed. Academic Association helped me immensely in shaping my views and guide me in the right direction to achieve my goal.

– Suraiya Gaffar, CTO (Rank-1) WBCS-2014

Academic Association helped me immensely

I was completely unaware about the interview process. Academic Association helped me immensely to overcome my ignorance about the interview process. Mock interviews followed by regular analysis assisted me to overcome my short comings.

-Abhishek Basu, WBFS - 2013 (Rank-1)
Executive (Rank-4), WBCS-2014
CO-OPT. Service (Gr.A) WBCS-2015

প্রথম অ্যাটেম্পটে এক্সিকিউটিভ পাওয়ার জন্য সঠিক গাইডেন্স একমাত্রে পাওয়া যায় এখানেই

এম.এ পড়ার সময় অঞ্জন নন্দীর পরামর্শে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে ভর্তি হই। এখানকার স্যারদের পরামর্শ আমাকে সাফল্যের সঠিক রাস্তাটি খুঁজে নিতে সাহায্য করে। যার ফলশ্রুতিতে আমি প্রথমবার পরীক্ষা দিয়েই এক্সিকিউটিভে সফল হই। আমার পরিবার, দেবর্পিতা ব্যানার্জী, দিবাকর দাস প্রস্তুতির প্রত্যেকটি পদে সাহায্য করেছে। বর্তমানে নতুন প্যাটার্নের ডব্লুবিসিএস পরীক্ষার সবচেয়ে ভাল প্রস্তুতির ক্ষেত্র হল অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন।

-Amit Biswas, Executive WBCS-2014

প্রস্তুতির জন্য সামিম স্যারের সম্পাদিত 'WBCS SCANNER' বইটি দেখে অনুশীলন করেছিলাম

ইন্টারভিউ - এ সফল হওয়ার জন্য অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এর মক ইন্টারভিউ এবং গ্রুমিং ক্লাস অত্যন্ত ফলদায়ক। এখানে অভিজ্ঞ টিচার দ্বারা যে ভাবে ইন্টারভিউ ক্লাস নেওয়া হয় তা এককথায় অনবদ্য । আমার মতো ইন্টারভিউ এর সম্পর্কে যারা ভীত তাদের কাছে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন হল আদর্শ স্থান। সামিম স্যারের বিশেষ ট্রেনিং-এ আমার এই সাফল্য।

-Habibur Rahaman,
Excise Service, (Gr-A) WBCS - 2015

I got immense assistance from the entire unit of Academic Association at every stage of WBCS.

Relentless effort with profound patience is the most requisite thing to achieve success in life . By the grace of the Almighty Allah , I have been able to crack WBCS Gr-A 2015 Success fully . I would like to express my heartfelt gratitude to Academic Association.

-Arman Alam,
ADSR (Gr. A), WBCS 2015

টপ র‍্যাঙ্ক অফিসারদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি এই প্রতিষ্ঠানের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

ডব্লুবিসিএস পরীক্ষায় সাফল্য লাভের জন্য চাই পরিশ্রম, নিষ্ঠা, ধৈর্য্য। আমার সাফল্যের পথে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সাহায্য অনস্বীকার্য। এখানকার মক ইন্টারভিউ আমাকে সাহায্য করেছে। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার সামিম সরকারের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও উৎসাহ দান আমার মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরী করেছে। অ্যাকাডেমিকের গ্রুমিংসেশনগুলো এক কথায় অভূতপূর্ব।

–সৌগত চৌধুরী, Executive WBCS-2015

ডব্লুবিসিএস পরীক্ষার স্ট্র্যাটিজিক দিকগুলির ব্যাপারে অবহিত হই স্যারের লেখা পড়ে

২০১১ সাল থেকে একটি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত সামিম স্যারের আর্টিকেল পড়ে খুবই উপকৃত হই। ডব্লুবিসিএস পরীক্ষার স্ট্র্যাটিজিক দিকগুলির ব্যাপারে অবহিত হই স্যারের লেখা পড়ে। তখন থেকে স্যারের ফ্যান হয়ে যাই। সামিম স্যার ও অ্যাকাডেমিকের অন্যান্য স্যারদের কাছে প্রয়োজনীয় সাজেশন পাই যা ইন্টারভিউ বোর্ডে আমাকে অনেক স্মার্ট, স্বচ্ছ ও সাবলীল করে তোলে। আমার স্ত্রী, বাবা ও মা যথেষ্ট উৎসাহ দিয়ে আমাকে আমার লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করেছে।

– সামিম বিশ্বাস, DSP, WBCS-2014

ভর্তি চলছে

- ❑ WBCS - 2017 মেনস্
- ❑ WBCS - 2017 মেনস্ মকটেস্ট
- ❑ WBCS - 2017 পোস্টাল কোর্স
- ❑ WBCS - 2018 প্রিলিম

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন ✆ 9038786000 / 9674478644

হেড অফিস ঃ দ্য সেল্ফ কালচার ইন্সটিটিউট, ৫৩/৬ কলেজস্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার), কলকাতা - ৭০০০৭৩

Website : www.academicassociation.in ✸ Uluberia-9051392240 ✸ Barasat-9800946498
✸ Berhampur-9474582569 ✸ Birati-9674447451 ✸ Siliguri-9474764635 ✸ Medinipur Town-9474736230

জীবাণুঘটিত বিপর্যয় : কার্যকারণ ও পরিত্রাণ

*জীবাণুঘটিত বিপর্যয় প্রাকৃতিক দূর্বিপাক বা জীবাণুঘটিত যুদ্ধ পরিস্থিতি ডেকে আনতে পারে। প্রাকৃতিক দূর্বিপাক হল তীব্র এবং চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া বা জলবায়ুঘটিত ঘটনাক্রম। গোটা বিশ্বের সমস্ত অংশেই স্বাভাবিক নিয়মেই প্রাকৃতিক দূর্বিপাক সংঘটিত হয়ে থাকে। 'প্রাকৃতিক দূর্বিপাক' 'প্রাকৃতিক বিপর্যয়'-এর রূপ ধারণ করে তখনই যখন মানুষের জীবন এবং জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাধারণভাবে, কোনও ধরনের মারণ বীজাণু, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যাকটিরিয়া বা ভাইরাস; যখন এমন কোনও জনসংখ্যার সংস্পর্শে আসে, যা তার কার্যকলাপে/প্রভাবে অসুরক্ষিত হয়ে পড়ে; সাধারণত তখনই জীবাণুঘটিত বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটে। এই সব জনগোষ্ঠী এমন পরিবেশে বসবাস করে যে তা সংশ্লিষ্ট মারণ বীজাণুর বংশবিস্তারের অতি সহায়ক বলেই এমন বিপর্যয় ঘটে। ঠিক কখন যে এইভাবে মারণ বীজাণুর প্রাদুর্ভাবের ঘটনা মহামারীর আকার নেবে আর কখন যে সেই মহামারী বিপর্যয়ের রূপ ধারণ করবে সে ব্যাপারে সঠিক কোনও সিদ্ধান্তে এখনও উপনীত হওয়া যায়নি। লিখেছেন—***ড. অর্চনা সুদ***

কোনও নির্দিষ্ট ধরনের অণুজীব/জৈববস্তু ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে বিধ্বংসী রূপ নিলে তাকে বলা হয় জীবাণুঘটিত বিপর্যয় (Biological disasters) এ ধরনের বিপর্যয়ের ফলে মহামারী অথবা আরও ব্যাপক আকারে বিশ্ব জুড়েই (Pandemic Level) উদ্ভিদ, প্রাণী বা কীটপতঙ্গের জীবন হয়রানির মুখে পড়ে অথবা কোনও রোগব্যাধি, ভাইরাস ছড়িয়ে যায়। কলেরা এবং H1N1 ইনফ্লুয়েঞ্জা বা সোয়াইন ফ্লু-এর আকস্মিক প্রাদুর্ভাব জীবাণুঘটিত বিপর্যয়ের উদাহরণ। মহামারী আকারে জীবাণুঘটিত বিপর্যয়ের মাধ্যমে কোনও নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী অথবা এলাকার মধ্যে বহু সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত হয়। অন্যদিকে, আরও ব্যাপকতর 'Pandemic' স্তরের জীবাণুঘটিত বিপর্যয়ের প্রভাব আরও বিপুল পরিমাণ এলাকার উপর পড়ে। কখনও কখনও গোটা মহাদেশ এমনকী বিশ্ব জুড়েই এর থাবা প্রসারিত হয়। কলেরা হল মহামারী আকারে জীবাণুঘটিত বিপর্যয়ের, অন্যদিকে সোয়াইন ফ্লু দ্বিতীয় ধরনের অর্থাৎ আরও ব্যাপকতর জীবাণুঘটিত বিপর্যয়ের উদাহরণ। ইবোলা, ডেঙ্গু জ্বর, ম্যালেরিয়া এবং হাম অন্যান্য কয়েকটি মহামারীর উদাহরণ।

জীবাণুঘটিত বিপদ (Biological hazards), যা কি না আবার জৈব-বিপদ (Biohazards) নামেও পরিচিত , বলতে মূলত বোঝানো হয় পরজীবী, ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাক এবং প্রোটিনজাত কোনও জীবাণুঘটিত বস্তু বা জৈবিক পদার্থ যা জীবকূলের, বিশেষত মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে

আশঙ্কা ডেকে আনে। এর মধ্যে পড়ছে মানুষের শরীর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর চিকিৎসা বর্জ্য বা কোনও অণুজীব (Micro-organism)-এর নমুনা, ভাইরাস বা জীবাণু সূত্রে উৎপন্ন জৈব-বিষ (Toxin) ইত্যাদি। অন্যান্য জীবের পক্ষে হানিকর বস্তুও এর মধ্যেই পড়ে। এই সমস্ত অণুজীব আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে। সংক্রমণের শিকার কোনও মানুষের দেহরস বা কলুষিত বস্তুর সংস্পর্শে এলে এমনটা ঘটে। এই সমস্ত জীবাণুঘটিত বিপদ মানুষের স্বাস্থ্যের উপর হানিকারক প্রভাব ফেলে মূলত তিনভাবে—সংক্রমণ, অ্যালার্জি এবং বিষক্রিয়া ঘটিয়ে।

জৈব-বিপদ এর প্রতীক চিহ্নকে সাধারণত সতর্কতা জারির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, যাতে করে সংশ্লিষ্ট বস্তুর থেকে সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কা প্রকাশ পায় তথা তা থেকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি গোচরে আসে। জৈব-বিপদের প্রতীক চিহ্নটির নক্শা ১৯৬৬ সালে প্রস্তুত করেন চার্লস বল্ডউইন। দাউ কেমিক্যাল কোম্পানিতে কলুষিত করে এমন পদার্থ বিষয়ক পরিবেশ-স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ হিসাবে কাজ করতেন ভদ্রলোক। যেসব জৈবিক বস্তু/উপাদান থেকে স্বাস্থ্যহানির বেশ বেশিমাত্রায় ঝুঁকি থাকে তার উপর লেবেল সাঁটার সময় এই চিহ্ন লাগানো হয়। Unicode-এ জৈব-বিপদের প্রতীক চিহ্ন হল U + 2623।

✶ ✶ ✶ ✶ ✶

জীবাণুঘটিত বিপর্যয় প্রাকৃতিক দূর্বিপাক বা জীবাণুঘটিত যুদ্ধ পরিস্থিতি (Biological Warfare) ডেকে আনতে পারে। প্রাকৃতিক দূর্বিপাক হল তীব্র এবং চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া বা জলবায়ুঘটিত ঘটনাক্রম। গোটা বিশ্বের সমস্ত অংশেই স্বাভাবিক নিয়মেই প্রাকৃতিক দূর্বিপাক সংঘটিত হয়ে থাকে। 'প্রাকৃতিক দূর্বিপাক' 'প্রাকৃতিক বিপর্যয়'-এর

রূপ ধারণ করে তখনই যখন মানুষের জীবন এবং জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাধারণভাবে, কোনও ধরনের মারণ বীজাণু (Malignant agent), বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যাকটিরিয়া বা ভাইরাস; যখন এমন কোনও জনসংখ্যার সংস্পর্শে আসে, যা তার কার্যকলাপে/প্রভাবে অসুরক্ষিত হয়ে পড়ে; সাধারণত তখনই জীবাণুঘটিত বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটে। এই সব জনগোষ্ঠী এমন পরিবেশে বসবাস করে যে তা সংশ্লিষ্ট মারণ বীজাণুর বংশবিস্তারের অতি সহায়ক বলেই এমন বিপর্যয় ঘটে। ঠিক কখন যে এইভাবে মারণ বীজাণুর প্রাদুর্ভাবের ঘটনা মহামারীর আকার নেবে আর কখন যে সেই মহামারী বিপর্যয়ের রূপ ধারণ করবে সে ব্যাপারে সঠিক কোনও সিদ্ধান্তে এখনও উপনীত হওয়া যায়নি।

মহামারীর পরিস্থিতির মোকাবিলায় সিদ্ধান্ত নেওয়া, পরামর্শদাতা কমিটি গঠন এবং আপৎকালীন চিকিৎসা পরিষেবার বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে সঞ্চালক মন্ত্রক (Nodal Ministry) হিসাবে কাজ করে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী, স্বাস্থ্য হল রাজ্যের আওতাধীন বিষয়। জীবাণুঘটিত বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের প্রাথমিক দায়-দায়িত্ব বর্তায় রাজ্য সরকারগুলির উপরেই। রোগ-জীবাণুর আকস্মিক প্রাদুর্ভাবের বিষয়টির কার্যকারণ অনুসন্ধানের বিষয়ে সঞ্চালক এজেন্সি হল জাতীয় সংক্রামক ব্যাধি প্রতিষ্ঠান (National Institute of Communicable Diseases—NICD)। NICD এবং ভারতীয় চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (Indian Council of Medical Research—ICMR)—এই দুই সংস্থাই শিক্ষণ/প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পরীক্ষাগার সহায়তা ইত্যাদি জোগায়।

জীবাণুঘটিত বা বীজাণুসৃষ্ট যুদ্ধ পরিস্থিতি (Biological warefare/GW) তৈরি করা হয় যুদ্ধের অন্যতম কৌশল হিসাবে। জীবাণুঘটিত জৈব-বিষ বা ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাকের মতো সংক্রামক এজেন্ট ব্যবহার করে মানুষ, পশু ও উদ্ভিদ জগতের বিনাশ করা বা তাদের শক্তিসামর্থ্যের উপর আঘাত হানা হয়। জীবাণুঘটিত হাতিয়ার (Biological Weapons) বলতে এমন সব জীবিত জৈববস্তু বা অবিকল প্রতিরূপ তৈরিতে সক্ষম সত্ত্বা (যেমন, ভাইরাস—একে সর্বজনীনভাবে 'জীবিত' বলে গণ্য করা হয় না) বোঝায় যারা সংক্রমণের শিকার জীবদেহের মধ্যে প্রজনন বা প্রতিরূপ গঠনে সক্ষম। জীবাণুঘটিত হাতিয়ারকে 'জৈব-হাতিয়ার' (Bio-weapons), 'জীবাণুঘটিত ভীতিজনক এজেন্ট' (Biological threat agents) বা 'জৈব-এজেন্ট' (Bio-agents) ইত্যাদি বিবিধ নামে উল্লেখ করা হয়। কীটপতঙ্গ ঘটিত/সৃষ্ট যুদ্ধ পরিস্থিতি (Entomological warfare)-কেও জীবাণুঘটিত হাতিয়ারেরই আরেকটি প্রকরণ হিসাবে গণ্য করা হয়। পারমাণবিক (Nuclear), জৈবিক (Biological) এবং রাসায়নিক (Chemical) হাতিয়ার ব্যবহার করে গণহত্যালীলা সংঘটিত করা হলে সময় বিজ্ঞানের পরিভাষায় সংক্ষেপে তাকে বলা হয় 'NBC'। রাসায়নিক এবং জীবাণুঘটিত/জৈবিক যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে খানিকটা সম্পর্ক বজায় আছে। কারণ, এক্ষেত্রে যে বিষাক্ত পদার্থ (Toxin) ব্যবহৃত হচ্ছে তা তৈরি হয় জীবিত জীবসত্ত্বার দ্বারা। একে জৈব-সন্ত্রাস (Bio terrorism) বলেও গণ্য করা হয়।

"জীবাণুঘটিত যুদ্ধ পরিস্থিতির (BW) মোকাবিলায় সঞ্চালক মন্ত্রক হিসাবে কাজ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এ বিষয়ে ব্যবস্থাপনার জন্য স্বারাষ্ট্রমন্ত্রকের সাথে অংশীদার হিসাবে কাজ করে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। এক্ষেত্রে ভয় বা আশঙ্কা কতটা তা পরিমাপ, বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাপত্র গড়ে তোলা এবং গোপন তথ্যাদি জোগাড়, সরবরাহ করার কাজটা করে থাকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

নির্দিষ্ট কিছু রোগব্যাধির আকস্মিক প্রাদুর্ভাবের ক্ষেত্রে সতর্কতা জারি এবং তার মোকাবিলায় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্ব জুড়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র বিশেষ অবদান রয়েছে।"

জীবাণুঘটিত যুদ্ধ পরিস্থিতির (BW) মোকাবিলায় সঞ্চালক মন্ত্রক হিসাবে কাজ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এ বিষয়ে ব্যবস্থাপনার জন্য স্বারাষ্ট্রমন্ত্রকের সাথে অংশীদার হিসাবে কাজ করে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। এক্ষেত্রে ভয় বা আশঙ্কা কতটা তা পরিমাপ, বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাপত্র গড়ে তোলা এবং গোপন তথ্যাদি জোগাড়, সরবরাহ করার কাজটা করে থাকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

নির্দিষ্ট কিছু রোগব্যাধির আকস্মিক প্রাদুর্ভাবের ক্ষেত্রে সতর্কতা জারি এবং তার মোকাবিলায় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্ব জুড়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র বিশেষ অবদান রয়েছে। এজন্য এই সংস্থা নির্দিষ্ট যেসব কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে করে চলেছে তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল।

- জাতীয় নজরদারি কর্মসূচি জোরদার করার কাজ চালিয়ে যাওয়া, বিশেষ করে মহামারী সংক্রান্ত বিদ্যা (Epi demiology) এবং ল্যাবরেটরি টেকনিকস্-এর ক্ষেত্রে।
- রোগব্যাধীর আকস্মিক প্রাদুর্ভাব সংক্রান্ত সত্যতা যাচাই করা খবরাখবর প্রচার করা এবং তার মোকাবিলা করার জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদানের বন্দোবস্ত করা।
- গোটা বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে মহামারীর কারণ ঘটানোর সম্ভাবনা আছে এমন রোগব্যাধি সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও তার প্রচারের ব্যবস্থা করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (Centre for Disease Control–

CDC) জীবাণুঘটিত বিপর্যয়ের সম্ভাব্য কারণ হয়ে উঠতে পারে এ ধরনের জৈবিক বিপদকে চারটি জৈব সুরক্ষা স্তরে (Bio Safety Level—BSL 1-4) শ্রেণিবদ্ধ করেছে।

★ **জৈব সুরক্ষা স্তর-এক (BSL-1) :** *Bacillus subtilis*, শ্বাপদ জীবের হেপাটাইটিস, *Escherichia Coli*, Varicella (জল বসন্তের বীজাণু) ইত্যাদি ব্যাকটিরিয়া ও ভাইরাস, কিছু টিস্যু (কোষকলা) কালচার এবং অ-সংক্রামক ব্যাকটিরিয়া। এই স্তরে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিশেষ সুযোগ থাকে না। সাধারণত দস্তানা এবং মুখাবরণী ব্যবহারের মতো কিছু সুরক্ষামূলক উপায় নেওয়া হয়।

★ **জৈব সুরক্ষা স্তর-দুই (BSL-2) :** ব্যাকটিরিয়া এবং ভাইরাস যা মানুষের ক্ষেত্রে কেবল ছোটোখাটো রোগের কারণ; অথবা হেপাটাইটিস A, B এবং C, কিছু ইনফ্লুয়েঞ্জা A স্ট্রেইন, লাইম রোগ (Lyme disease), মামপস্, হাম, Scrapie (ছাগল ও ভেড়ার এক মারণ রোগ), Salmonella (এই নামের ব্যাকটিরিয়া মাধ্যমে খাদ্যে এক ধরনের বিষক্রিয়াজনিত অসুস্থতা), ডেঙ্গু জ্বর, HIV ইত্যাদি। জৈব সুরক্ষার এই স্তরে আরও অনেক বেশি চূড়ান্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। এর মধ্যে থাকছে নির্বীজনের জন্য 'Autoclaves'-এর মতো সরঞ্জাম এবং জৈবিক সুরক্ষা ক্যাবিনেট ব্যবহার।

★ **জৈব সুরক্ষা স্তর-তিন (BSL-3) :** মানুষের ক্ষেত্রে মারাত্মক থেকে প্রাণঘাতী রোগব্যাধির কারণ ঘটায় এমন ব্যাকটিরিয়া ও ভাইরাস। যেমন—অ্যানথ্রাক্স, ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস, ভেনেজুয়েলান ইকুইন এনসেফেলাইটিস, SARS ভাইরাস, MERS করোনা ভাইরাস, হান্টা ভাইরাস, যক্ষা, টাইফাস, রিফট্ ভ্যালি জ্বর, রকি মাউন্টেন স্পটেড জ্বর, পীত জ্বর এবং ম্যালেরিয়া। এই স্তরের আওতায় পড়ে *Plasmodium falciporum*, *Trypanosoma cruzi*-এর মতো পরজীবীও। এই সব রোগব্যাধির সংক্রমণ রোধে আরও অনেক বেশি কঠোরভাবে নিরাপত্তা বিধি মেনে চলতে হয়, যেহেতু বাতাসের মাধ্যমে অধিকাংশ রোগের সংক্রমণ ঘটে। এসব রোগের প্রতিষেধক/চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা অবগত।

★ **জৈব সুরক্ষা স্তর-চার (BSL-4) :** সাধারণভাবে মানুষের ক্ষেত্রে প্রাণঘাতী এমন সব ভাইরাস, যার এখনও কোনও প্রতিষেধক আবিষ্কার করা যায়নি বা সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতি বিষয়ে নির্দিষ্ট ধারণা নেই—এই স্তরে পড়ে। যেমন—Marburg ভাইরাস, Ebola ভাইরাস, Lassa জ্বরের ভাইরাস, Crimeam-Congo hemorrhagic জ্বর এবং অন্যান্য রোগব্যাধি যার ফলে দেহের ভেতর রক্তপাত হয়। প্রতিষেধক থাকা সত্ত্বেও বসন্ত রোগ (Small pox)-এর বীজাণু Variola ভাইরাসকে এই শ্রেণিতে ফেলা হয়। উল্লেখ্য বিশ্ব থেকে এই রোগটিকে নির্মূল করা গেছে। এই স্তরের ক্ষেত্রে সংক্রমণ রোধের সবচেয়ে বড়ো উপায় সংক্রমণপীড়িত ব্যক্তি বা তার চিকিৎসায় নিযুক্তদের সংস্পর্শে না আশা। সংক্রমণ পীড়িতকে পুরোপুরি আলাদাভাবে এমন নির্দিষ্ট অবরুদ্ধ কামরায় রাখার ব্যবস্থা করা, যেন সেখানকার বাতাসও পরিবেশে না মিশকে পারে; বায়ু চলাচলের আলাদা ব্যবস্থা করা। সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ এবং প্রস্থান পথে একাধিক শাওয়ারের ব্যবস্থা, বায়ুশূন্য কামরা, অতিবেগুনি রশ্মির দ্বারা আলোকিত কামরা, স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংক্রমণের ঘটনা ধরা পড়বে এমন ব্যবস্থা-সহ অন্যান্য যাবতীয় সুরক্ষা কবচের বন্দোবস্ত রাখা দরকার এই জীবাণুঘটিত বিপদ থেকে আগাম সতর্কতা অবলম্বনে উপায় হিসাবে। এসব ল্যাবে জল ও বাতাস সরবরাহের ক্ষেত্রে তথা নিকাশের ক্ষেত্রেও সবসময় পরিশোধন করে তবে বাইরের পরিবেশের সংস্পর্শে আসতে দিতে হবে; যাতে দুর্ঘটনা/অসাবধানতাবশতও জীবাণু পরিবেশে ছড়িয়ে পড়তে না পারে। বর্তমানে কোনও ব্যাকটিরিয়াকে এই স্তরে রাখা হয় না।

★ ★ ★ ★ ★

রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নীতিসমূহ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালিত করে থাকে এমন বহু আইন লাগু আছে। রোগব্যাধির সংক্রমণ ঠেকাতে সরকার এই সমস্ত আইন কাজে লাগাতে পারে।

(i) জল (দূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৭৪;

(ii) বায়ু (দূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮১;

(iii) পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন, ১৯৮৬ এবং বিধিসমূহ (১৯৮৬);

(iv) জৈব চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা এবং হ্যান্ডলিং) বিধিসমূহ, ১৯৯৮—উদ্দেশ্য হাসপাতাল/জৈব চিকিৎসা বর্জ্যের কোনও বাছবিচার না করে যত্রতত্র ঠিকানা লাগানোর অভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করা।

(v) বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন (DMAct), ২০০৫—বিপর্যয়ের কার্যকর ব্যবস্থাপনা তথা এর সঙ্গে জড়িত যাবতীয় বিষয় এবং ঘটনাক্রমের মোকাবিলার সংস্থান রাখা হয়েছে এতে। বিপর্যয় নিবারণ, প্রশমন, মোকাবিলার প্রস্তুতি, মোকাবিলায় সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ, পীড়িতদের পুনর্বাসন এবং পূর্বাবস্থাপ্রাপ্তি ইত্যাদির জন্য সর্বস্তরে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপারেশনাল ফ্রেমওয়ার্ক গড়ে তোলার সংস্থান এর মধ্যে পড়ছে। জীবাণুঘটিত বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিবারণ-পৃথককরণ (Quarantive) পন্থাপদ্ধতি আইনগতভাবে লাগু করা হবে বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিচর্যা ক্ষেত্রকে ব্যবহার করে।

পেশা এবং কাজের জায়গায় মানুষজন পরস্পরের সংস্পর্শে আসে। ফলে জীবাণুঘটিত বিপদের সম্ভাবনা এদের/এখানে বেশি।

- চিকিৎসা পেশার সঙ্গে জড়িত চিকিৎসা কর্মী, সাফাই কর্মী, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান।
- স্বাস্থ্য পরিচর্যা পরিষেবা।
- সাফাই পরিষেবা এবং সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা।
- তরল বর্জ্য এবং আবর্জনা সংগ্রহ ও তা ঠিকানা লাগানোর মতো পরিবেশগত স্বাস্থ্যবিধান পরিষেবা ক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মী।
- কাগজ এবং কাগজজাত পণ্য, বয়ন, চর্ম্য ও পশুলোম ইত্যাদির মতো; উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহাংশ কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে এমন ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পক্ষেত্র এবং কৃষি, মৎস্য চাষ, পশু চিকিৎসা পরিষেবা ইত্যাদি ক্ষেত্র।
- কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কাজ করে এমন বদ্ধ জায়গায় ইনডোর কর্মস্থল। যেমন—হোটেল, রেঁস্তোরা। এসব জায়গায় কার্পেট, ওয়াল পেপারের মতো ঘরসজ্জা উপকরণ, টবের গাছ, সিক্ত ও ড্যাম্প পড়া জায়গা, জল রাখার বাসনপত্র ইত্যাদি অণুজীবের বংশ বিস্তারের আঁতুড়ঘর।

কর্মস্থলে সতর্কতামূলক এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপত্রের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া জরুরি। জৈবিক/ জীবাণুঘটিত বিপদ থেকে সতর্ক হওয়া তথা তা নিয়ন্ত্রণের জন্য সবচেয়ে আগে দরকার যেখান থেকে জীবাণু/সংক্রমণ ছড়াচ্ছে সেই উৎসকেই নির্মূল করা।

- **ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ন্ত্রণ** : আলো-হাওয়াবাতাস পর্যাপ্ত পরিমাণে চলাচলের ব্যবস্থা করা; দূষণ ছড়াচ্ছে যেখান থেকে তা আংশিকভাবে অন্য অংশের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা; সংক্রামক ব্যাধির জন্য নির্দিষ্ট চিকিৎসা বিভাগের/ওয়ার্ডের জন্য পৃথক হওয়াবাতাস চলাচলের ব্যবস্থা ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা; অতিবেগুনি রশ্মির ল্যাম্প ব্যবহার ইত্যাদি দূষণ পদার্থ ছড়াতে বাধা দেন।
- **ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি** : সংক্রমণ এড়াতে সব থেকে সহজ ও প্রাথমিক উপায় হল কাজ শুরু করার আগে ও শেষ করার পরে এবং সতর্কতামূলক পোষাক পরিচ্ছদ পরার আগে ও পরে তরল সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া।
- **পেশাগত সুরক্ষা** : কর্মীদের প্রত্যেককে অবশ্যই ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে। কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত অভ্যাস। ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সাজসরঞ্জামের মধ্যে পড়ছে মুখোশ, দস্তানা, সুরক্ষাকারী পোশাক-আশাক, চক্ষু আবরণী, মুখাবরণী এবং জুতোর কভার।

সুরক্ষাকারী পোশাক-আশাকের মধ্যে গোটা শরীরকে সুরক্ষিতভাবে আবৃত করে রাখবে এমনসব সরঞ্জামই পড়ছে। মস্তক আবরণী (hood), গাউন, অ্যাপ্রন, মুখাবরণী এবং জুতোর কভার। এগুলি সবই জল নিরোধক বা তরল অভেদ্য উপাদানে তৈরি হতে হবে। ফলে রক্ত, রক্তরস বা দেহ নিঃসৃত অন্য কোনও তরল সংক্রামিত ব্যক্তির শরীর থেকে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা/পরিচর্যা কর্মীর মধ্যে উন্মুক্ত ক্ষত ইত্যাদির মাধ্যমে সংক্রমণ ঘটাতে পারবে না বা তার নিজের পোশাক পরিচ্ছদকে দূষিত/কলুষিত করবে না। এভাবেই রোগ সৃষ্টিকারী বীজাণু ইত্যাদির (Pathogen) বিস্তার এবং ছোঁয়াছুঁয়ির মাধ্যমে সংক্রমণের সম্ভাবনা অনেকখানি কমানো যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুরক্ষাকারী পোশাক-আশাক একবার ব্যবহারের পর বিনষ্ট করে ফেলা হয়। কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য নির্বীজন (Sterilization)-এর পর তা পুনর্ব্যবহার-যোগ্য। তবে ব্যবহার করার আগে তা পরীক্ষা করে নেওয়া এবং ছেঁড়াকাঁটা থাকলে বদলে নেওয়া দরকার।

সুরক্ষা গগল্‌স/চশমা এবং মুখাবরণী রোগ সৃষ্টিকারী বীজাণু ইত্যাদি বহনকারী রক্ত, রক্তরস ও নিঃসৃত অন্যান্য দেহরসের সংস্পর্শ থেকে চোখকে সুরক্ষিত রাখে। না হলে তা শ্লেষ্মাঝিল্লি (Mucosa)-এর মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করতে পারে।

দস্তানা সংক্রামিত ব্যক্তির রক্ত, রক্তরস, দেহরস এবং শরীরের অন্যান্য কোষকলা তথা প্যাথোজেন প্রদূষিত বস্তুর সংস্পর্শ থেকে হাতকে সুরক্ষিত রাখে। ফলে যখন চোখ, নাক, মুখ স্পর্শ করা হয় সংক্রমণকে এড়ানো যায়। প্যাথোজেন-এর হাত থেকে উন্মুক্ত ক্ষতকেও সুরক্ষিত রাখে দস্তানা। অধিকাংশ দস্তানাই ব্যবহারের পর বিনষ্ট করে ফেলতে হয়। অতি বিপজ্জনক পদার্থ নাড়াচাড়ার সময়ও দস্তানা পরা উচিত।

কর্মস্থলের চৌহদ্দির বাইরে থেকে প্যাথোজেন বয়ে আনাকে প্রতিহত করতে পারে জুতোর কভার। এই কভার সাধারণত এমন জল নিরোধক উপাদানে তৈরি যা পিছল নয়। একবার ব্যবহারের পরই এই কভার বিনষ্ট করে ফেলা হয়। কভার তৈরির সময় তার আকার-আয়তনের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয় যাতে স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলায় কোনও অসুবিধা না হয় তথা পায়ের পাতার ত্বকের মাধ্যমে কলুষ/দূষণ সংক্রমণ ঠেকানো যায়।

- **নির্বীজন** : এমন এক পদ্ধতি যার সাহায্যে অতি উচ্চ তাপমাত্রা ও চাপের দ্বারা ব্যাকটিরিয়া তথা জৈবনাশক (Biocide) পদার্থ ব্যবহার করে অণুজীব (Micro organism) ধ্বংস করা হয়। নির্বীজন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে যে জায়গায় সংক্রমণ ঘটেছে তার চৌহদ্দির মধ্যে এমনকি প্রতিটি কোণ-কানাচও সংক্রমণ মুক্ত করা উচিত, যে কোনও বিষাক্ত বস্তুর ন্যূনতম অবশিষ্টাংশও সাফাই করে। ফলে, শরীরের কোনও অংশ উন্মুক্ত থাকলেও সংক্রমণের ঝুঁকি তথা শারীরিক হানির অবকাশ থাকে না সংশ্লিষ্ট কর্মীর।
- **শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষেত্রে সুরক্ষা** : সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথাযথ সুরক্ষাদায়ী সাজসরঞ্জামের ব্যবহার বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে জীবাণুঘটিত বিপদের হাত থেকে সুরক্ষার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

প্রথমেই আসে শল্য চিকিৎসায় ব্যবহৃত মুখোশের কথা। সাধারণত বুনটবিহীন (Non-

woven) কাপড়ের তিনটি স্তর থাকে এই মুখোশে। শ্বাসবায়ুর সঙ্গে বড়ো মাপের দূষণকণার শরীরে প্রবেশ ঠেকাতে কার্যকর। N95 বা উন্নত স্তরের সরঞ্জাম অতিসূক্ষ্ম আকারের কঠিন ও তরল দূষণকণা শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে শরীরে প্রবেশ প্রতিহত করতে ছাঁকনি হিসাবে কাজ করে। ফলে বায়ুজাত (airborne) অণুজীব এবং এরোসল (Aerosols) সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা মেলে। তৃতীয় উপায় হল বিদ্যুৎচালিত বায়ু পরিশোধন ব্যবস্থাযুক্ত সরঞ্জাম (Powered Air Purifying Respirator—PAPR) ব্যবহার। এই ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যে ফিল্টার ব্যবহার করছে তার মধ্যে দিয়ে বাতাস পাঠানোর জন্য বৈদ্যুতিক ব্লোয়ার ব্যবহার করা হয়। চতুর্থ পদ্ধতি হল পরিশুদ্ধ বাতাস সরবরাহ। এয়ার কম্প্রেসর বা উচ্চ-চাপ সিলিন্ডার থেকে নলের মাধ্যমে বিশুদ্ধ বাতাস সরবরাহ।

এক্ষেত্রে কোন ধরনের সুরক্ষাদায়ক সাজসরঞ্জাম বেছে নেওয়া/ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর—জীবাণুঘটিত বিপদের ধরন, সংশ্লিষ্ট কর্মীর কাজের প্রকৃতি এবং কর্মস্থলের পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার উপর।

- জীবাণুঘটিত বিপদ ডেকে আনতে সক্ষম আবর্জনার থলেতে 'Biological hazard'-এর ছাপ ও সতর্কতা সূচক লেবেল লাগানো দরকার। মুখোশ, দস্তানা জৈবিক দূষণ থেকে সুরক্ষাকারী পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি ব্যবহারের পর একটি থলেতে ভরে বা সঠিকভাবে মোড়কে মুড়ে রাখতে হবে। এরপর তা সিল করে বিশেষ পদ্ধতিতে অপসারণের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় জমা করতে হবে।
- **চিকিৎসার বন্দোবস্ত :** যে কোনও আপৎকালীন পরিস্থিতিতে জরুরি চিকিৎসা পরিষেবার যাবতীয় বন্দোবস্ত এবং বিশেষ ধরনের চিকিৎসা পরিষেবার বন্দোবস্ত রাখতে হবে।
- **বাঁধাধরা পন্থাপদ্ধতি :**

- পুষ্টিকর এবং সঠিক মাত্রার খাবার-দাবার খেতে হবে।
- শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতার সর্বশেষ স্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে।
- ভিড়ভাট্টা এড়িয়ে চলতে হবে।
- আলো-হাওয়াবাতাস চলাচলের উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- বেশি গরম বা ঠাণ্ডা আবহাওয়া থেকে সুরক্ষার দিকে নজর রাখতে হবে।

✶ ✶ ✶ ✶ ✶

এবার আসা যাক জৈবিক বা জীবাণুঘটিত বিপর্যয়ের নিবারণের প্রসঙ্গে। এই ধরনের বিপর্যয়ের থেকে নিস্তার পেতে নিবারণ এবং আগাম প্রস্তুতি অত্যন্ত কার্যকর উপায়। এক্ষেত্রে আসন্ন জৈব-আশঙ্কার সংকেত (biothreats), চিকিৎসা এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়ক দিকগুলির পর্যালোচনার উপর জোর দিতে হবে। বিপর্যয়-পরবর্তী সময়ে তার অভিঘাত হ্রাস তথা অসুরক্ষার পরিসর কমাতে চিকিৎসা পরিষেবার প্রসার এবং দীর্ঘমেয়াদি কলাকৌশল বেশ ভালোরকম কাজে আসে। নিবারণ এবং আগাম প্রস্তুতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাবের আগেই আগাম সতর্কতা হিসাবে টিকাকরণ; মহামারী সংক্রান্ত অভ্রান্ত খবরাখবর সংগ্রহের জন্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা; সতর্কতাসূচক বার্তা আগাম নির্ভুলভাবে পড়ে নিতে পারবে তথা বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনে এই মহামারী পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে কিনা সেই সূত্রও ধরে ফেলতে পারবে এমন এক শক্তিশালী নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলা; রোগব্যাধির আকস্মিক প্রাদুর্ভাবকে চিহ্নিত করা, তার কারণ অনুসন্ধান ও মোকাবিলা বা ব্যবস্থাপনার কাজে সহায়তা জোগাতে সক্ষম এমন নজরদারি, পরীক্ষাগার এবং হাসপাতাল ব্যবস্থার সামর্থ্যের পরিসর আরও বাড়ানো ইত্যাদি এরকমই কয়েকটি দিক। জৈবিক বিপর্যয় নিবারণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় এখানে উল্লেখ করা হল।

- **অসুরক্ষার দিকগুলির বিচার-বিশ্লেষণ এবং ঝুঁকি পরিমাপ :**
- **পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা :**

(i) জৈবিক বিপর্যয় এবং কলেরা, হেপাটাইটিস, উদরাময়, দাস্ত ইত্যাদির মতো জলবাহিত জীবাণুর মাধ্যমে মহামারীর আকার নিতে সক্ষম রোগব্যাধির থেকে পরিত্রাণ পেতে নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ এবং নিকাশি পাইপলাইনের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাপক কাজে আসে।

(ii) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জনগোষ্ঠীর মধ্যে সরকারি সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। মানুষকে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার গুরুত্ব এবং তার জন্য কী কী করণীয় সে সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। যেমন—নাওয়া-ধোওয়া, সাফ-সাফাইয়ের নির্দিষ্ট জায়গা করা, এক ঘরে গাদাগাদি করে না শোওয়া ইত্যাদি।

(iii) জীবাণুর বাহক (Vector) নিয়ন্ত্রণ। বাহক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (Vector Control Programme)-এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাগ আছে।

(ক) পরিবেশগত ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মকাণ্ড এবং নির্দিষ্ট প্রজাতিভিত্তিক সংহত বাহক নিয়ন্ত্রণ পন্থাপদ্ধতি গ্রহণ।

(খ) সঠিক জলসম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জীবাণুর/অণুজীবের প্রজনন স্থল ধ্বংস করা। বদ্ধ জল নিকাশের তথা জল জমতে না দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

(গ) পরিবেশে ধোঁয়া এবং নিয়মিত কীটনাশক ছড়িয়ে জীবাণুর বাহক নিয়ন্ত্রণ।

(ঘ) ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধির উপর নজর রাখা।

(iv) শবদেহ কবর দেওয়া/ঠিকভাবে অপসারণ।

- **বিপর্যয়-পরবর্তী মহামারীর ঘটনা নিবারণ :** যে কোনও বিপর্যয়ের পর, তা সে প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট যে ধরনেরই হোক না কেন মহামারীর ঘটনা ঘটার প্রবল ঝুঁকি থাকে। এই ব্যাপারটিকে মাথায় রেখে সম্ভাব্য মহামারী পরিস্থিতির মোকাবিলায় নিবারমূলক আগাম বন্দোবস্ত করতে হবে।

- **সংহত রোগব্যাধি নজরদারি ব্যবস্থা :** নজরদারি বাহিনী রোগব্যাধির সম্ভাব্য উৎস/ সূত্র, রোগ ছড়ানোর পদ্ধতি এবং মহামারীর ঘটনার অনুসন্ধান ইত্যাদি বিষয়ের দেখভাল করবে।
- কোনও ব্যাধির আকস্মিক প্রাদুর্ভাবের ঘটনার খোঁজ পাওয়া এবং তা দমনের চারটি প্রাথমিক ধাপ।

(i) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ক্ষেত্রে নিযুক্ত চিকিৎসকদের কাছে বিষয়টি প্রথম ধরা পড়ে/ স্পষ্ট হয়।

(ii) জনস্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের কাছে নজরদারি ব্যবস্থার তরফে খবরাখবর আসতে থাকে।

(iii) নজরদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদির (Data) সঙ্গে মহামারীর ঘটনার কী ধরনের মিল রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখা।

(iv) যথাযথ চিকিৎসা পরিষেবা সরবরাহ এবং জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত উদ্যোগ গ্রহণ।

- ভেষজবিদ্যা সংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ; 'Chemoprophylaxis', (অর্থাৎ, রাসায়নিক বস্তু প্রয়োগ করে রোগের বাড়বাড়ন্ত প্রতিহত করা) টিকাকরণ এবং অন্যান্য নিবারণমূলক পন্থা গ্রহণ।
- জৈব সুরক্ষা (Bio safety) এবং জৈব নিরাপত্তা (Biosecurity)-এর দিকে নজর। বহু পরীক্ষাগার/ গবেষণাগারে এমন ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস, জৈব-বিষ ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা নাড়াচাড়া করা হয় যা পরিবেশে ছড়িয়ে পড়লে জীবাণুঘটিত বিপর্যয়ের সম্ভাব্য এজেন্ট হিসাবে কাজ করতে পারে। এই সব ল্যাবরেটরির সুরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা যাচাই করার উপযুক্ত একটা বন্দোবস্ত গড়ে তোলা দরকার।
- বিল্ডিং এবং অফিসের সুরক্ষা। গুরুত্বপূর্ণ বিল্ডিংগুলির সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা দরকার জীবাণুঘটিত বিপর্যয়ের সাপেক্ষে। এজন্য প্রয়োজন মতো এই সব বিল্ডিং-এ সঠিকভাবে যাচাই করে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ছাড়া অন্যানদের প্রবেশ নিষিদ্ধ/নিয়ন্ত্রিত করার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ভেন্টিলেশন সিস্টেমে HEPA ফিল্টার লাগানোর বন্দোবস্ত করে গুরুত্বপূর্ণ বিল্ডিংগুলির মধ্যে বাতাসের মাধ্যমে সংক্রামক বীজাণুর প্রবেশ আটকানো যেতে পারে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিল্ডিংগুলির যথাযথ সাফ-সাফাইয়ের মাধ্যমে কলুষিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে এবং নিরাপত্তা বন্দোবস্ত জোরদার করতে হবে।
- কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।

পরিশেষে বলা যেতে পারে, জৈবিক বিপদ প্রাণঘাতী হতে পারে। অথবা তা কর্মীদের শরীর স্বাস্থ্যের এবং কর্মদক্ষতার পক্ষে কম-বেশি হানিকারক প্রভাব ফেলতে পারে। কর্মস্থলের পরিবেশ যাতে কর্মীদের শরীর-স্বাস্থ্যের পক্ষে নিরাপদ ও অনুকূল হয় তার জন্য জৈবিক বিপদ প্রতিহত এবং নিয়ন্ত্রণ করতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।❑

(লেখক ড. সুদ দিল্লিস্থিত 'ESIC Dental College and Hospital'-এর জৈবরসায়ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। ইমেল : archanasood65@yahoo.com)

কলকাতা বইমেলা, ২০১৭

(২৫ জানুয়ারি-৫ ফেব্রুয়ারি)

মিলনমেলা প্রাঙ্গণ

প্রকাশন বিভাগের স্টল নং

৪২৩

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা : 'ট্রমা' পরিচর্যার গুরুত্ব

ভারতের মতো বিকাশশীল দেশগুলির বেশ কিছু ভৌগোলিক অঞ্চলে বিপর্যয়/দুর্ঘটনাপীড়িত মানুষের মানসিক ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় শুশ্রূষা/পরিচর্যা দেওয়ার মতো 'ট্রমা' ব্যবস্থা আদপেই নেই। এরই সাথে খামতি রয়েছে আর একটি বিষয়েও—পীড়িতদের পুনর্বাসনের আগে পর্যন্ত দুর্ঘটনা স্থলেই আহতদের পরিচর্যা। মূলত এই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কারণেই বিপর্যয়/দুর্ঘটনা পীড়িতদের মধ্যে মৃত্যুহার এসব দেশে বেড়ে যাচ্ছে। অতি সংক্ষেপে বলা যায়, ট্রমা পরিচর্যা ব্যবস্থা যে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে তা হল—"সঠিক সময়ে সঠিক পরিচর্যার জন্য সঠিক রোগী/পীড়িত যেন সঠিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ-সুবিধার নাগাল পায়।"
লিখেছেন—**ড. অমিত গুপ্তা** *এবং* **অধ্যাপক মহেশ চন্দ্র মিশ্র**

'বিপর্যয়'-এর সংজ্ঞাটা ঠিক কী? বলা হয়ে থাকে, সমাজ-সংসারের স্বাভাবিক কাজকর্মে কোনও গুরুতর ছন্দপতন, যার কারণে ব্যাপক হারে জীবন ও সম্পত্তি হানি ঘটে তথা পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি এতটাই মাত্রা ছাড়িয়ে যায় যে, সংশ্লিষ্ট সমাজ নিজের সহায়সম্পদের জোরে তার সাথে যুঝে উঠতে পারে না। নিরাপত্তার প্রশ্নে নড়বড়ে কোনও সমাজের উপর কোনও দুর্বিপাক, তা সে প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট যাই হোক না কেন, আঘাত হানলে বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটে। কোনও জনগোষ্ঠী, কাঠামো, পরিষেবা বা ভৌগোলিক অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্থ বা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে কোনও দুর্বিপাকের কবলে পড়ে। এদের প্রকৃতি, গঠন বা দুর্বিপাকপ্রবণ এলাকার কতটা কাছাকাছি অবস্থান তার উপর নির্ভর করে এই ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা। একেই বলা হচ্ছে 'Vulnerability'; বাংলা করলে যার অর্থ দাঁড়ায় 'নিরাপত্তার প্রশ্নে ঘাটতি'।

ভারতে বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন ধরনের বিপর্যয়ের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, অর্থাৎ সেই নিরাপত্তার প্রশ্নে ঘাটতি। এ দেশের ৫৮.৬ শতাংশেরও বেশি ভূ-ভাগ মাঝারি থেকে সুতীব্র মাত্রার ভূকম্পপ্রবণ। ৪০ মিলিয়ন হেক্টরের বেশি জমি (১২ শতাংশ) বন্যাপ্রবণ এবং নদীক্ষয় কবলিত। মোট ৭,৫১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলরেখার মধ্যে ৫,৭০০ কিলোমিটারের কাছাকাছিই ঘূর্ণিঝড় এবং সুনামি প্রবণ। চাষযোগ্য এলাকার ৬৮ শতাংশই খরাপ্রবণ। দেশের পার্বত্য এলাকাগুলিতে ভূমিধস এবং তুষারধসের ঝুঁকি খুব বেশি। সর্বোপরি রাসায়নিক, জৈবিক, তেজস্ক্রিয়তাঘটিত এবং পারমাণবিক সংকট-সহ মনুষ্যসৃষ্ট অন্যান্য বিপর্যয়ের নিরিখেও ভারতের নিরাপত্তা ঘাটতি রয়েছে।

এক যথাযথ বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার অনেকগুলি দিক থাকে। এর কয়েকটি বিষয়ে কাজ করতে হয় বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার আগে। যার মধ্যে পড়ছে নিবারণ (Prevention), উপশম (Mitigation) এবং প্রস্তুতি (Preparedness) পর্ব এবং বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার পর ব্যবস্থাপনার যে দিকগুলি কাজে আসে তার মধ্যে রয়েছে তড়িঘড়ি হস্তক্ষেপ (Response), পুনর্বাসন (Rehabilitation), পুর্নগঠন (Reconstruction) এবং পূর্বাবস্থাপ্রাপ্তি (Recovery)।

আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সঞ্চালক সংস্থা (Nodal body) হিসাবে 'জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ' (National Disaster Management Authority—NDMA)-কে সাথে নিয়ে তথা অন্যান্য বিভিন্ন মন্ত্রকেও সামিল করে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত আছে এক বিস্তারিত পরিসরে। একাজে সামিল অন্যান্য মন্ত্রকগুলি হল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, রেলমন্ত্রক, পারমাণবিক শক্তি মন্ত্রক, অর্থমন্ত্রক, কৃষিমন্ত্রক, পরিবেশ ও বন মন্ত্রক, শক্তিমন্ত্রক, গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রক, মহাকাশ ও টেলি-যোগাযোগ মন্ত্রক, জলসম্পদ মন্ত্রক, সড়ক পরিবহণ ও রাজপথ মন্ত্রক।

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫ ঘোষিত হওয়ার পর 'জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ' গঠিত হয়। পদাধিকারবলে এই সংস্থার সভাপতি পদে থাকেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি এবং সহ-সভাপতি/সচিব ছাড়া সংস্থায় আরও নয়জন সদস্য থাকেন। NDMA-এর দায়িত্ব হিসাবে বর্তায় বিভিন্ন নীতি (Policies), পরিকল্পনা (Plans) এবং নির্দেশিকা (Guidelines) প্রণয়ন। বিভিন্ন মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারগুলির পরিকল্পনাসমূহকে অনুমোদন; নীতি লাগু এবং রূপায়ণের ক্ষেত্রে সমন্বয়সাধন; বিপর্যয়-পূর্ববর্তী পর্যায়ে উপশম কর্মকাণ্ডে তহবিল সংস্থানের সুপারিশ; তথা এই সময়পর্বে বিপর্যয় নিবারক প্রস্তুতি এবং সামর্থ্য গড়ে তোলার অন্যান্য পন্থাপদ্ধতি হাতে নেওয়া ইত্যাদি সবই NDMA-এর নিয়মিত কার্যকলাপের মধ্যে পড়ে। সর্বোপরি, দেশের যে কোনও স্থানে বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার পরে যথাযথ হস্তক্ষেপের বিষয়ে কার্যকর আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা তথা অন্যান্য দেশ থেকে ডাক পেলে তাদেরও যথাযথ সহায়তা প্রদান NDMA-র এক বিশাল দায়িত্ব। বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫-এ রাজ্য এবং জেলা স্তরেও বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ

চিত্র-১
বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা চক্র

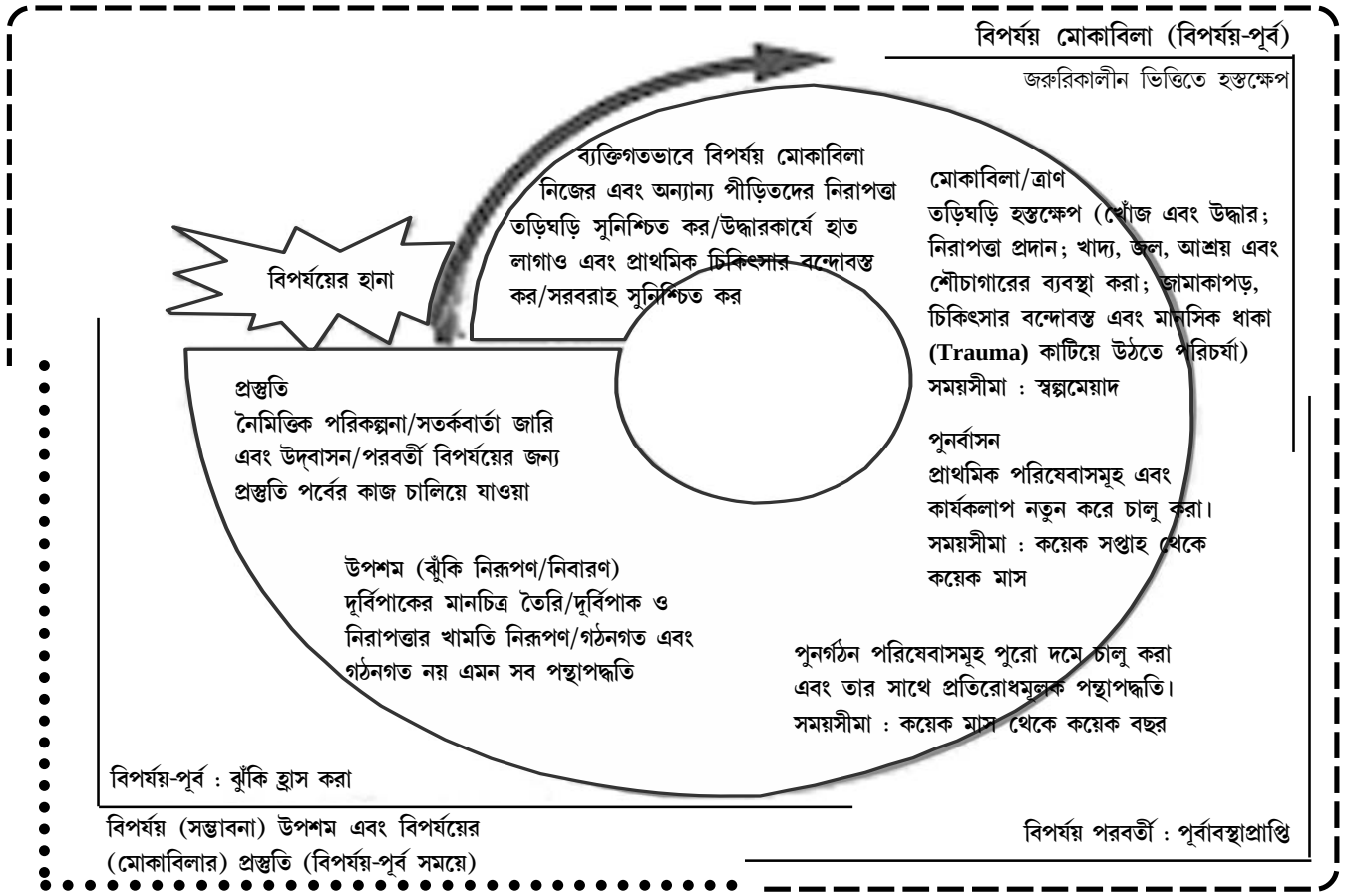

সূত্র : Are you Prepared? Learning from the Great Han Shin—Awaji Earthquake Disaster-Handbook for Disaster Reduction and Volunteer activities.

গঠন করার কথা বলা হয়েছিল, যার শীর্ষে থাকবেন জেলাশাসক/জেলা সমাহর্তা।

বিপর্যয়ে চিকিৎসা পরিষেবা

ভারতে, 'জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ' গণ হতাহতের ঘটনার ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রস্তুতির জাতীয় স্তরের নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে—'National Guidelines for Medical Preparedness in Mass Casualty Management' (NG-MPMCM)। বিপর্যয়ের ঘটনায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের আওতাধীন 'স্বাস্থ্য পরিষেবা মহানির্দেশালয়' (Directorate General of Health Services—DGHS)-এর 'আপৎকালীন চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান বিভাগ' (Energency Medical Response Division) আপৎকালীন সহায়তা কার্য (Emergency Support Function—ESF) পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রধান দায়িত্বটি পালন করে। এর মধ্যে পড়ছে সমন্বয়সাধনের জন্য সঞ্চালক আধিকারিকদের (Nodal officers) চিহ্নিত করা, সদর দপ্তর এবং ক্ষেত্রীয় স্তরে 'সংকট ব্যবস্থাপনা কমিটি' এবং দ্রুত হস্তক্ষেপের জন্য বাহিনী ঠিক করে দেওয়া, প্রয়োজনীয় সহায়সম্পদের ফর্দ তৈরি ইত্যাদি। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের সচিবের আওতাধীন সংকট ব্যবস্থাপনা গোষ্ঠী এক্ষেত্রে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের মুখ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। তাদের পরামর্শ দেওয়ার কাজটি করে থাকে 'স্বাস্থ্য পরিষেবা মহানির্দেশালয়'-এর অধীনস্ত 'কারিগরি পরামর্শদাতা কমিটি'।

জেলা, রাজ্য এবং জাতীয়—এই সর্ব স্তরেই বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি চালু করা দরকার। এই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যপূরণের জন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক দেশে গণ হতাহতের ঘটনার (Mass casualty) ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার কাজ হাতে নিয়েছে। আপৎকালীন সময়ে হাসপাতালগুলি পরিস্থিতি মোকাবিলায় নিজেদের কীভাবে প্রস্তুত রাখবে সে বিষয়ে যারা প্রশিক্ষণ দেবেন সেই ভাবী প্রশিক্ষক (Instructors)-দের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ১০০ জন প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে হাসপাতালগুলির নৈমিত্তিক পরিকল্পনা এবং প্রশিক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রাথমিক সংস্থা হল 'জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান' (National Institute of Disaster

চিত্র-২
জেলা স্তরে বিপর্যয়ে হস্তক্ষেপের ঘটনার রাশ নিয়ন্ত্রণ

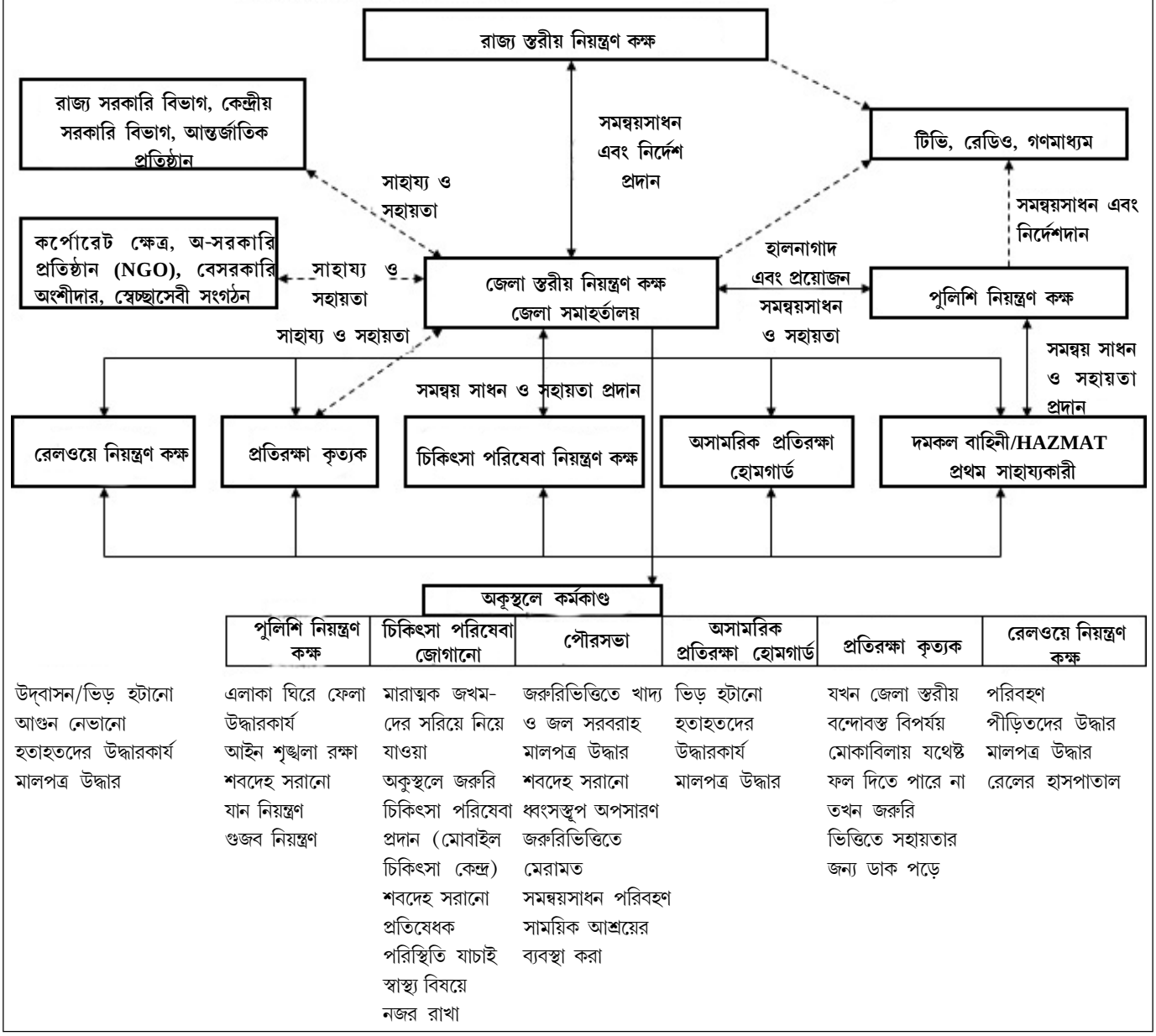

Management—NIDM) এবং 'জাতীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিষ্ঠান' (National Institute of Health and Family Welfare—NIHEW)। এখানে আগে যে প্রশিক্ষকদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাদের বেছে নেওয়া হয়েছিল রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল এবং মেডিক্যাল কলেজগুলি থেকে। ঠিক করা হয়েছে পরবর্তী পর্যায়ে মূলত জেলা স্তর পর্যন্ত হাসপাতালের ব্যবস্থাপকদের রোগব্যাধির আকস্মিক প্রাদুর্ভাব (Outbreaks) এবং জৈবিক সংকটকালীন পরিস্থিতি (Biological emergencies)-এর জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। রোগব্যাধির আকস্মিক প্রাদুর্ভাবের কারণ অনুসন্ধান এবং তার মোকাবিলার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজটি 'সংহত রোগ নজরদারি কর্মসূচি' (Integrated Disease Surveillance Programme—IDSP)-র আওতায় করে থাকে সংক্রামক ব্যাধি সংক্রান্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান—National Institute for Communicable Diseases (NICD)। রোগব্যাধির আকস্মিক প্রাদুর্ভাব বিষয়ে কারণ অনুসন্ধানের জন্য সঞ্চালক (Nodal) এজেন্সি হল NICD। NICD এবং ICMR (Indian Council of Medical Research)—এই দুই প্রতিষ্ঠান মিলে একযোগে শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং ল্যাবরেটরি বিষয়ক সহায়তা প্রদান করে থাকে। অধিকাংশ রাজ্যেই স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণের জন্য একটি করে আঞ্চলিক দপ্তর আছে। সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক

অধিকর্তা বিপর্যয় হেতু স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যে সমস্যা/ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তার কার্যকর ব্যবস্থাপনার জন্য রাজ্য সরকারের সাথে যোগাযোগ রেখে চলে।

পথ নিরাপত্তা এবং বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে আপৎকালীন চিকিৎসা সুবিধাকে আরও জোরদার করতে নির্দিষ্ট কিছু সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামোগত মানোন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। পাশাপাশি, সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের সাথে সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে সম্প্রতি আরও একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্বর্ণ চতুর্ভুজ নেটওয়ার্ক (Golden Quadrilateral Network)-এর আওতায় যেসব রাজপথ পড়ছে তাতে প্রতি ১০০ কিলোমিটার অন্তর দুর্ঘটনাপীড়িত ব্যক্তির মানসিক ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার জন্য শুশ্রূষা/ পরিচর্যা কেন্দ্র (Trauma Centre) এবং প্রতি ৫০ কিলোমিটার অন্তর অ্যাম্বুলেন্স-এর বন্দোবস্ত করার জন্যই এই উদ্যোগ। ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের সহায়তায় মোট ২৬-টি প্রথম স্তরীয় (Level-I) এবং ২৫০-টি দ্বিতীয় স্তরীয় (Level-II) 'ট্রমা' পরিচর্যা বন্দোবস্ত তৈরির পরিকল্পনা বিবেচনা করা হয়েছে।

২০০৬-'০৭ সালে চিকিৎসা জগতে দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান 'All India Institute of Medical Sciences' (AIIMS)-এ দুর্ঘটনা/বিপর্যয়পীড়িত ব্যক্তিদের চিকিৎসা-পরিচর্যার জন্য 'J.P.N. Apex Trauma Centre' গঠন করা হয়। 'ট্রমা' বিধ্বস্ত রোগীর জন্য উন্নত মানের পরিচর্যার বন্দোবস্ত করতে এই উদ্যোগ আমাদের একধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। দেশের অন্যান্য 'ট্রমা' পরিচর্যা কেন্দ্রগুলির সামনে এই প্রতিষ্ঠান 'রোল মডেল' হিসাবে কাজ করে। রোগীদের সর্বোত্তম পরিচর্যার বন্দোবস্তের প্রাথমিক দায়িত্বের থেকে উপরে উঠে কাজ করছে এই শীর্ষ স্তরীয় ট্রমা কেন্দ্র। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ দানের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে এই কেন্দ্র। ফলত, গোটা দেশজুড়ে 'ট্রমা' পরিচর্যা বন্দোবস্তের সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে দেশের প্রশাসনের কাজটা অনেক সহজ হচ্ছে।

'ট্রমা' পরিচর্যার জন্য যেসব বিশেষ সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্ত থাকা দরকার, তার সব কিছুই মজুত আছে এই 'Apex Trauma Centre'-এ, অত্যন্ত সুদক্ষ ফ্যাকাল্টি এবং আবাসিক কর্মী-সহ। ফলে চব্বিশ ঘণ্টাই এখানে অবিরাম কাজ চলে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে বছরে প্রায় ষাট হাজার রোগীর চিকিৎসা-পরিচর্যা-শুশ্রূষার কাজ চলে; এবং ছয় হাজারের বেশি বড়ো মাপের শল্যচিকিৎসার কাজ হয়ে থাকে। বর্তমানে এই কেন্দ্রের শয্যা সংখ্যা প্রায় ১৯০, ICU শয্যা সংখ্যা ৩৭, অপারেশন থিয়েটারের সংখ্যা ৬ এবং ৩৫ শয্যার জরুরি বিভাগ ও 'Triage' আছে। কেন্দ্রের শয্যা সংখ্যা বাড়িয়ে ২৬০ করার পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ চলছে। একই সাথে ১৬-টি অতিরিক্ত ICU শয্যা, ৩-টি অপারেশন থিয়েটার এবং ৩০ শয্যার জরুরি বিভাগ ও 'Triage' তথা বেসরকারি ওয়ার্ড/বিভাগ এবং রোগীর দেখাশোনায় নিযুক্ত কর্মী (Patient attendant)-দের জন্য হোস্টেল এবং হেলিপ্যাড তৈরির কাজও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। পরিকল্পনা আরও আছে। আগামী ৫-৬ বছরের মধ্যে কেন্দ্রের শয্যা সংখ্যা ৭৫০ করার জন্য কথাবার্তা ইতোমধ্যেই অনেকটা এগিয়েছে।

বিপর্যয়ের পর চিকিৎসা পরিচর্যা সংক্রান্ত সহায়তা প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক উপযুক্ত পরিকাঠামো ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থাপত্র-সহ ভ্রাম্যমান হাসপাতাল চালু করার উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। এর কাজ প্রায় শেষের মুখে। এই হাসপাতালের পুরো পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে বিশেষ ধরনের কন্টেনারের মধ্যে। ১০০ শয্যাবিশিষ্ট যে কন্টেনার রেলপথ বা বিমানপথে দুর্ঘটনা স্থলে বয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এর মধ্যে অপারেশন থিয়েটার, ICU, শল্যচিকিৎসার পরবর্তী পর্যায়ের পরিচর্যা, জল পরিশোধনে ব্যবস্থাযুক্ত ইউনিট, রান্নার ব্যবস্থা, শৌচাগার এবং জরুরি বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা সব রকম সুযোগ-সুবিধাই থাকছে।

যে কোনও বিপর্যয় বা প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের ক্ষেত্রে প্রথম যারা সংগঠিতভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ তথা উদ্ধার-ত্রাণের বন্দোবস্ত করতে এগিয়ে আসতে সমর্থ তারা হল অবশ্যই সশস্ত্র বাহিনী। সশস্ত্র বাহিনীর চিকিৎসা পরিষেবা ব্যবস্থায় যথেষ্ট সংখ্যক অত্যন্ত সুদক্ষ ও সুপ্রশিক্ষিত এবং উপযুক্ত সাজসরঞ্জামে সজ্জিত আধিকারিকরা রয়েছেন,

"যে কোনও বিপর্যয় বা প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের ক্ষেত্রে প্রথম যারা সংগঠিতভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ তথা উদ্ধার-ত্রাণের বন্দোবস্ত করতে এগিয়ে আসতে সমর্থ তারা হল অবশ্যই সশস্ত্র বাহিনী। সশস্ত্র বাহিনীর চিকিৎসা পরিষেবা ব্যবস্থায় যথেষ্ট সংখ্যক অত্যন্ত সুদক্ষ ও সুপ্রশিক্ষিত এবং উপযুক্ত সাজসরঞ্জামে সজ্জিত আধিকারিকরা রয়েছেন, যারা যে কোনও আকস্মিক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্বল্প সময়ের নোটিশে উপযুক্ত পরিষেবা দিতে তৈরি। দেশজুড়ে সশস্ত্র বাহিনীর যেসব হাসপাতাল রয়েছে তাদের সমস্ত ধরনের বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে যথোপোযুক্ত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার যাবতীয় অভিজ্ঞতা এবং নৈপুণ্য রয়েছে। সব ধরনের বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় মহড়া দিতে দিতে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষতার বেশ উঁচু স্তরে পৌঁছে গেছে এই সব হাসপাতাল।"

যারা যে কোনও আকস্মিক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্বল্প সময়ের নোটিশে উপযুক্ত পরিষেবা দিতে তৈরি। দেশজুড়ে সশস্ত্র বাহিনীর যেসব হাসপাতাল রয়েছে তাদের সমস্ত ধরনের বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে যথোপোযুক্ত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার যাবতীয় অভিজ্ঞতা এবং নৈপুণ্য রয়েছে। সব ধরনের বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় মহড়া দিতে দিতে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষতার বেশ উঁচু স্তরে পৌঁছে গেছে এই সব হাসপাতাল। সংকটকালীন পরিস্থিতিতে এই সব হাসপাতালগুলি তিন হাজারের মতো অতিরিক্ত শয্যার বন্দোবস্ত করতে সক্ষম। কোনও বিপর্যয়ের দরুন বহুসংখ্যক মানুষ হতাহত হলে সেই জরুরীকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলায় নিজেদের বর্তমান সহায়সম্পদ/ সুযোগ-সুবিধার সাহায্যেই উল্লেখিত শয্যাগুলিকে কাজে লাগাতে পারে। এই সব শয্যা যে কোনও মুহূর্তে রোগী ভরতির জন্য সর্বদা তৈরি রাখা হয়। বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য সশস্ত্র বাহিনীর সব হাসপাতাল এবং মেডিক্যাল ইউনিটগুলিতে চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং মেডিক্যাল স্টোর্স আলাদাভাবে চিহ্নিত করে রাখা হয় খুব কম সময়ের নোটিশে তৈরি হয়ে কাজে নেমে পড়ার জন্য। সহজেই বহনযোগ্য যথেষ্ট সংখ্যক জরুরি চিকিৎসা সরঞ্জামও তৈরি রাখা হয় বিপর্যয় স্থলেই পীড়িতদের পরিচর্যা এবং হতাহতদের সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের জন্য। বাহিনীর নিজস্ব ভ্রাম্যমান ক্ষেত্রীয় হাসপাতাল এবং ভ্রাম্যমান শল্যচিকিৎসক দলও আছে। এরা স্বল্প সময়ের নোটিশে দ্রুত অকুস্থলে পৌঁছে যেতে পারে দরকার মতো। এই সব ভ্রাম্যমান হাসপাতালগুলিতে মেডিক্যাল স্টোর্স, ওষুধপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জাম, শয্যা, তাঁবু ইত্যাদি যাবতীয় উপকরণ মজুত থাকে। প্রত্যেক মেডিক্যাল ইউনিটের দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে ন্যস্ত থাকে নির্দিষ্ট আধিকারিকের উপর, যাতে বিপর্যয়ের সময় এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করেই কাজে নেমে পড়া যায়। এমনকী আপৎকালীন পরিবহণের জন্য অ্যাম্বুলেন্স এবং অন্যান্য যানবাহনকেও আলাদাভাবে চিহ্নিত করে রাখা হয়। এছাড়াও দরকার পড়লে সশস্ত্র বাহিনীর অন্যান্য ইউনিট থেকেও যানবাহনের বন্দোবস্ত করা হয় এ কাজের জন্য।

বিপর্যয় ও 'ট্রমা' পরিচর্যার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় ঘাটতি

স্বাস্থ্য রাজ্যের নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয়। চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের বিষয়ে তথা বহুসংখ্যক মানুষ হতাহত হওয়ার ঘটনার মোকাবিলা—উভয় ক্ষেত্রেই প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব মূলত বর্তায় রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগের উপর। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তিন স্তরে বিন্যস্ত।

- ব্লক স্তরে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (PHC) এবং গোষ্ঠী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (CHC);
- জেলা স্তরে জেলা হাসপাতাল;
- মুখ্য শহরগুলিতে রাজ্যের সদর দপ্তরে তৃতীয় পর্যায়ের (Tertiary) চিকিৎসা পরিচর্যা প্রতিষ্ঠান।

যাই হোক, রাজ্যগুলি এই সব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ডাক্তারি শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, স্থানীয় সংস্থার সূত্রে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের মতো নানাবিধ কার্যকলাপ পরিচালনা করে বিভিন্ন ধরনের এজেন্সি/বিভাগের সাহায্যে। বহুসংখ্যক মানুষ হতাহত হলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত পরিকাঠামো ব্লক স্তরে থাকে না। উপ-জেলা হাসপাতাল এবং জেলা হাসপাতালগুলিতে শয্যা সংখ্যা ১০০ থেকে ২৫০-এর মধ্যে। এই সব হাসপাতালের মাধ্যমে 'ট্রমা' পরিচর্যা-সহ মধ্যম স্তরীয় (Secondary Level) চিকিৎসা পরিচর্যা প্রদানের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তবে দেশের বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে জেলা স্তরের হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে গুণমানের নিরিখে যথেষ্ট ফারাক রয়েছে। রাজ্যের রাজধানী শহরগুলিতে তথা অন্যান্য বড়ো মাপের শহরে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর বা পৌরসভা পরিচালিত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও অন্যান্য তৃতীয় পর্যায়ের চিকিৎসা পরিচর্যা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানই এমনকী তাদের নিত্যদিনের কাজের চাপেই নাস্তানাবুদ এবং তাদের আর অতিরিক্ত কোনও দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষমতাও বেশ সীমাবদ্ধ।

ভারতের মতো বিকাশশীল দেশগুলির বেশ কিছু ভৌগোলিক অঞ্চলে বিপর্যয়/দুর্ঘটনাপীড়িত মানুষের মানসিক ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় শুশ্রূষা/পরিচর্যা দেওয়ার মতো 'ট্রমা' ব্যবস্থা আদপেই নেই। এরই সাথে খামতি রয়েছে আর একটি বিষয়েও—পীড়িতদের পুনর্বাসনের আগে পর্যন্ত দুর্ঘটনা স্থলেই আহতদের পরিচর্যা। মূলত এই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কারণেই বিপর্যয়/দুর্ঘটনা পীড়িতদের মধ্যে মৃত্যুহার এসব দেশে বেড়ে যাচ্ছে। অতি সংক্ষেপে বলা যায়, ট্রমা পরিচর্যা ব্যবস্থা যে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে তা হল—"সঠিক সময়ে সঠিক পরিচর্যার জন্য সঠিক রোগী/পীড়িত যেন সঠিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ-সুবিধার নাগাল পায়।"

● হাসপাতালে পৌঁছানোর আগের সময়পর্বে পরিচর্যা :

দেশের বেশ কিছু রাজ্যের নির্দিষ্ট কিছু ভৌগোলিক এলাকায় উন্নত চিকিৎসা সরঞ্জামের বন্দোবস্ত যুক্ত অ্যাম্বুলেন্স বা সেবায়ন, প্রশিক্ষিত কর্মী এবং যথাযথ প্রতিষ্ঠানের নাম-গন্ধ নেই। আবার কিছু রাজ্যের এ ধরনের এলাকায় এসব সুযোগ-সুবিধা খানিকটা থাকলেও তা মান্ধাতা আমলের। সর্বজনীন আপৎকালীন নম্বর ১০৮-কে অ্যাম্বুলেন্স/পুলিশ এবং দমকলের জন্য কিছু রাজ্য গ্রহণ করেছে। বর্তমানে এই ব্যবস্থা GPS/GPRS ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা যাতে ঠিকমতো কাজ করে তার জন্য কর্মী প্রশিক্ষণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন দিকের উপর যথাযথ আইনগত এবং নিয়ামন সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার কোনও বন্দোবস্ত নেই।

● হাসপাতালে 'ট্রমা' পরিচর্যা :

(ক) পরিকাঠামো—পীড়িত যদি বিভিন্ন ধরনের আঘাতের শিকার হন (Multiply injured patients) তবে তাকে সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পর্যায় (গোষ্ঠী স্বাস্থ্যকেন্দ্র/জেলা হাসপাতাল) এবং তৃতীয় পর্যায় (বিশ্ববিদ্যালয়/মেডিক্যাল কলেজের মতো হাসপাতাল)-এর মতো স্বাস্থ্য পরিচর্যা পরিকাঠামো বর্তমানে অপারগ। গোটা দেশজুড়ে সর্বত্রই প্রয়োজনীয় যথাযথ চিকিৎসা সরঞ্জামযুক্ত জরুরি বিভাগের অভাব রয়েছে। বেসরকারি হাসপাতালগুলির জরুরি বিভাগে উন্নতমানের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম-

পরিকাঠামো থাকলেও পীড়িত ব্যক্তি সেই সুবিধার নাগাল পান না মূলত অর্থনৈতিক কারণে। এসব হাসপাতালে চিকিৎসা খরচ আকাশছোঁয়া।

(খ) প্রশিক্ষিত কর্মী—স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থার সমস্ত পর্যায়েই (প্রাথমিক, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়) গুরুতর আহত রোগীর সঠিক এবং কার্যকরভাবে শুশ্রূষা/পরিচর্যা করার মতো সঠিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর ঘাটতি রয়েছে. 'ট্রমা' পরিচর্যার জন্য আলাদাভাবে কর্মী-বাহিনী নির্দিষ্ট করে রাখার কোনও ধারণাই নেই। প্রায়শই এ ধরনের পীড়িতের শুশ্রূষা/পরিচর্যা যিনি করেন তার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে জীবন রক্ষার কায়দা-কানুন এবং কার্যপ্রণালি বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ/দক্ষতার খামতি থাকে। এছাড়াও আছে জরুরি বিভাগে কাজ করার মতো প্রশিক্ষিত ডাক্তার ও নার্সের অভাব। ঘাটতি রয়েছে 'ট্রমা সার্জেন' অর্থাৎ 'ট্রমা' পীড়িত রোগীর শল্য চিকিৎসার জন্য প্রশিক্ষিত শল্য চিকিৎসকের। আহত রোগীর সঠিক পরিচর্যার জন্য 'নিউরোসার্জন' , 'ট্রমা ইনটেনসিভ কেয়ার' ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলিতে 'সুপার স্পেশালিস্ট'-এর সংখ্যা নগণ্য। এর উপরে আবার পীড়িতদের পুনর্বাসনের বন্দোবস্তে সাহায্যকারী পেশাদারদের সংখ্যাও হাসপাতালগুলিতে যথেষ্ট নয়।

সুনির্দিষ্টভাবে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার দিকে নজর রেখে কাজ করবে এমন একটি চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলাটা নিতান্ত জরুরি। সেজন্য সর্বাগ্রে দরকার চিকিৎসক-চিকিৎসাকর্মী-পেশাদার-বিশেষজ্ঞ-সহ সব ধরনের মানবসম্পদের বিকাশ তথা পরিকাঠামোর মানোন্নয়ন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, রেলমন্ত্রক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক এবং বিভিন্ন অ-সরকারি প্রতিষ্ঠান (NGOs)-এর কাছে যেসব সহায়সম্পদ আছে তা ব্যবহার করেই একাজে সাফল্য আসবে। এর মধ্যে পড়ছে চিকিৎসক, নার্স, প্যারামেডিক্যাল কর্মী-সহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে জড়িত সবাইকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আর কোন কোন সম্পদকে ব্যবহার করা যেতে পারে তা চিহ্নিত করা।

জাতীয় স্তরে সামর্থ্য বৃদ্ধির উদ্যোগ

'JPN Apex Trauma Centre' বহু দিন ধরেই ATLS, AUTLS, ACCC, ATCN, PHTLS ইত্যাদি স্বল্পমেয়াদি কোর্স করিয়ে আসছে। পাশাপাশি, এই প্রতিষ্ঠান প্রতিরক্ষা কৃত্যক এবং রাজ্য সরকারের চাকরিতে নিযুক্ত চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য দীর্ঘমেয়াদি কোর্স চালু রেখেছে। 'ট্রমা সার্জারি' এবং 'ক্রিটিক্যাল কেয়ার'-এর ক্ষেত্রে 'Master of Surgery' (Mch)-র মতো সুপার স্পেশালিটি কোর্সও সম্প্রতি চালু করেছে AIIMS। AIIMS-ই দেশের প্রথম প্রতিষ্ঠান যারা 'ট্রমা সার্জারি'-র ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের জন্য শল্য চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের স্নাতক স্তরের বিধিবৎ কোর্স চালু করেছে।

ভারতে 'Advanced Thauma Life Support' (ATLS)-এর জন্য সামর্থ্যের পরিসর বাড়াতে 'জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় অগ্রণী প্রকল্পটি 'Apex Trauma Centre' ইতোমধ্যেই সম্পন্ন করেছে। দেশের তিনটি রাজ্যের থেকে চিকিৎসক, নার্স এবং প্যারামেডিক্যাল কর্মীদের 'BTLS' (Basic Trauma Life Support) এবং 'ATLS' (Advanced Trauma Life Support) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এই প্রকল্পের আওতায়। ATLS-এর ক্ষেত্রে সামর্থ্যের পরিসর আরও বাড়াতে যে সম্প্রসারিত প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে চিকিৎসা পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণদানের জন্য তা ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। এই সম্প্রসারিত প্রকল্পের লক্ষ্য হল 'Advanced trauma Care'-এর ক্ষেত্রে আগামী চার বছরের মধ্যে আরও প্রায় ১৮০০ চিকিৎসক এবং নার্সের প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করা।

সব শেষে বলা যেতে পারে, আমাদের জাপানের মতো বিপর্যয়প্রবণ জাতির কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবিষয়ে এগোতে হবে। ঘন ঘন বিপর্যয়পীড়িত এই দেশটি হাসপাতালে পৌঁছানোর আগের পর্যায়েই পীড়িতের মানসিক ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার কাজে সাহায্য করার জন্য একটা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার অঙ্গ হিসাবে। আমাদের দেশে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এমন একটি কেন্দ্র গড়ে তোলা দরকার যারা পুরো ব্যবস্থাটি পরিচালনার উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য নির্দেশ দানের কাজটি করবে। পাশাপাশি তৈরি করতে হবে একটি আপৎকালীন তথ্য ব্যবস্থা, যেখানে সমস্ত হাসপাতালগুলি হতাহতের সংখ্যা জানাবে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা চেয়ে যোগাযোগ করবে।❑

(লেখক ড. গুপ্তা 'JPN Apex Trauma Centre'-এর 'Trauma Surgery & Critical Care' বিভাগের শল্য চিকিৎসা অধ্যাপক তথা AIIMS-এর মুখপাত্র। ইমেল : amitguptaaiims@gmail.com

ড. মিশ্রা AIIMS-এর 'JPN Apex Trauma Centre'-এর প্রধান। ইমেল : mcmisra@gmail.com)

সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক : উল্লেখ ও বিপর্যয় ঝুঁকি হ্রাস

বিপর্যয়ের শিকার কম-বেশি সব দেশই। দুর্যোগে ক্ষতি হয় সব শ্রেণির মানুষের। তার মধ্যে গরিবদের ভোগান্তি অবশ্য সবচেয়ে বেশি হয়। কেননা অভাবের দরুন সংকট কটিয়ে ওঠার সামর্থ্য তাদের কম। দুর্বিপাকে, তা সে প্রাকৃতিক বা মনুষ্যকৃত যাই হোক না কেন, ঝুঁকি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের দায় অনেকখানি। সুস্থায়ী বা টেঁকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে এ এক মস্ত অন্তরায়। সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছতে তাই বিপর্যয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূলস্রোতে সামিল করার পক্ষে সওয়াল করেছেন নিবন্ধকার—**অধ্যাপক সন্তোষ কুমার**

পরিবর্তনই হচ্ছে একমাত্র ধ্রুব বা শাশ্বত। আশপাশের সবকিছু বদলাচ্ছে। জাগিয়ে তুলছে নতুন নতুন উচ্চাকাঙ্ক্ষা। মাথা চাড়া দিচ্ছে নতুন সব চ্যালেঞ্জ। আট ও নয়ের দশকে দেখা বিশ্বের পরিবেশ, আর্থনীতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক আবহ এখন আর তেমনটি নেই। প্রযুক্তি এবং প্রাকৃতিক পরিবেশও পথ দেখাচ্ছে উন্নয়ন তত্ত্ব বিষয়ক চর্চায়। ২০১৫ সালটি ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা ওই বছরে সই হয় তিন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চুক্তি। স্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG), জলবায়ু রদবদল সংক্রান্ত প্যারিস চুক্তি এবং বিপর্যয় বিষয়ক ঝুঁকি হ্রাসে সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক। এই তিন চুক্তির লক্ষ্য ও টার্গেট অর্জনে আন্তর্জাতিক মহল নিজেদের অঙ্গীকারবদ্ধ করেছে। তিনটি চুক্তিতেই অনেক সাধারণ দিক আছে; অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রেই চুক্তি তিনটি একরকম। বিপর্যয়জনিত ক্ষয়ক্ষতি দেখিয়েছে যে স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণ করতে হলে আমাদের অগ্রাধিকার দিয়ে এই ক্ষতি বন্ধ করতে হবে। এবং বিপর্যয় ঝুঁকি কমানোর জন্য জলবায়ু পরিবর্তন এবং সাংঘাতিক ঘটনাবলির দিকে নজর দেওয়া জরুরি। উন্নয়ন, বিপর্যয় ঝুঁকি এবং জলবায়ু পরিবর্তন এই তিনটি বিষয়ই পরস্পর যুক্ত এবং এ সবের সমাধানে তাই দরকার সংহতি।

বিপর্যয় ও স্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যের চ্যালেঞ্জ

সতেরোটি স্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যের মধ্যে ১০-টিতে বিপর্যয় ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কিত ২০-টিতে টার্গেট আছে। বিপর্যয় ঝুঁকি কমানো তাই এক মুখ্য উন্নয়ন স্ট্র্যাটেজি হিসেবে ঠাঁই করে নিয়েছে।

নিদারুণ দারিদ্র্য হঠানোর লক্ষ্য পূরণে বিপর্যয় সামলানোর ক্ষমতা তৈরি খুব গুরুত্বপূর্ণ। গরিবি আর্থনীতিক ও সামাজিক অসহায়তা সৃষ্টি এবং বৃদ্ধি করে বলে বিপর্যয় ঝুঁকির এ এক অন্যতম প্রধান চালক, ঝুঁকি বাড়ার ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের দায় অনেকখানি। এবং তা স্থায়ী উন্নয়নের অগ্রগতির লক্ষ্যে এক বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কি উন্নত কি উন্নয়নশীল সব দেশেই বিপর্যয়ের দরুন বহু কষ্টার্জিত উন্নয়নের হানি হয়, গরিব ও অসহায়দের ঠেলে দেয় আরও অভাবের মুখে। ২০৩০ সাল নাগাদ ৩২ কোটি ৫০ লক্ষ গরিব মানুষ প্রাকৃতিক দুর্বিপাক ও চরম জলবায়ুর কোপে পড়তে পারে; বিশেষত আফ্রিকার সাহারা লাগোয়া অঞ্চল এবং দক্ষিণ এশিয়ায়। এ থেকে স্পষ্ট, ভবিষ্যতে বিপর্যয় আরও বেশি মানুষকে যাতে দারিদ্র্যের মুখে ঠেলে না দিতে পারে সেজন্য গরিব জনগোষ্ঠীগুলির সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতা সৃষ্টি ও জোরদার এবং তাদের জীবিকা ও সম্পদ রক্ষা করা দরকার।

নেপাল ভূ-কম্পের পর ২.৫ থেকে ৩.৫ শতাংশ নেপালি পড়বে অভাবের কবলে। অর্থাৎ গরিবের সংখ্যা বাড়বে আরও ৭ লক্ষ এবং ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৭০০ কোটি ডলার। আরও দেখা যায় যে, মানব উন্নয়ন সূচকে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা ৬ জেলা ডোলাকহা, সিন্ধুপাল চক, গোর্খা, নুওয়াকট, রাসুওয়া ও ধাডিংয়ে বেশি অভাবি মানুষজন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। এ থেকে আরও একবার প্রমাণ মিলল বিপর্যয়ে গরিব ও অসহায়দের ভোগান্তি বেশি হয়।

সুস্থায়ী সামাজিক-আর্থনীতিক উন্নয়ন অর্জনের পথে আমাদের সমাজে বিপর্যয়ের আঘাত এক বড়ো আপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ লক্ষ লক্ষ কোটি ডলার, সমৃদ্ধ অঞ্চলের জন্য আমাদের লক্ষ্যের পক্ষে এ একটা ধাক্কা। কোনও বিপর্যয় ঘটলে তার অভিঘাতে কৃষি, আবাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিকাঠামোর মতো বিভিন্ন ক্ষেত্র পড়ে সমূহ ক্ষতির মুখে।

জমির যথেচ্ছ অপব্যবহারের ও পরিবেশ অবক্ষয়ের মতো অটেঁকসই উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বিপর্যয়ের অভিঘাত ও বিপর্যয়ের দরুন লোকজনের অসহায়তা বৃদ্ধির জন্য অনেকখানি দায়ি। এই অঞ্চলে বারবার এবং আরও বড়ো ধরনের বিপর্যয় ঘটতে থাকায়, মানুষজন, গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো এবং উন্নয়নকে রক্ষা করতে আমাদের দেশগুলিকে একযোগে সমস্যা সমাধান করতে হবে।

ঝুঁকি কমানোর ব্যবস্থায় বর্তমান ও ভবিষ্যতের সামাজিক এবং আর্থনীতিক ঝুঁকির কারণগুলি উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রক্রিয়ায় সনাক্ত ও বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। কর্মসংস্থান ও বাণিজ্য-সহ বিকাশ এবং উন্নয়নে জাতীয় টার্গেট পূরণ করতে হলে সরকারি নীতি কাঠামো ও পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সংকট ব্যবস্থাপনা থেকে ঝুঁকি ব্যবস্থায় বদলে যাওয়ার দিকটি অবশ্যই প্রতিফলিত হওয়া চাই।

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা

রাষ্ট্রসংঘের দেওয়া বিপর্যয়ের সংজ্ঞাই নেওয়া হয়েছে ২০০৫-এর জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইনে। এই সংজ্ঞা মোতাবেক "বিপর্যয় হচ্ছে একটা সমাজ বা সম্প্রদায়ের কাজকর্মে গুরুতর ব্যাঘাত; তা জীবন, সম্পত্তি, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি করে, যা কিনা ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় বা সমাজের পক্ষে শুধুমাত্র নিজের সহায়সম্পদ সম্বল করে সামাল দেওয়া অসম্ভব। সুচিন্তিত পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও ক্ষয়ক্ষতি কমানোর ব্যবস্থা মারফৎ প্রাকৃতিক দুর্বিপাক সামাল দেওয়া যায়।"

"বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা" বলতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের কাছে আলাদা আলাদা অর্থ বোঝায়। যারা ত্রাণ ও তৎক্ষণাৎ উদ্ধার কাজে যুক্ত তাদের কাছে এটা এক মানবিক সংকট ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনা। ক্ষতিগ্রস্তদের স্থায়ী ও অস্থায়ী পুনর্বাসনের দেখভালকারীরা মনে করেন এ হচ্ছে পুনর্বাসন ব্যবস্থাপনা। এ দুইই বিপর্যয় ঘটার পরের কর্মকাণ্ড। ঝুঁকি হ্রাস এবং প্রস্তুতির জন্য বিপর্যয়ের আগেই পরিকল্পনা তৈরি করার চলন হয়েছে ইদানীং এবং যারা এতে বিশ্বাসী তাদের কাছে এটা উভয়ত, অর্থাৎ প্রাক্-বিপর্যয় ঝুঁকি হ্রাস ও বিপর্যয়-উত্তর হস্তক্ষেপ। বিশ্বের অধিকাংশ জায়গা, বিশেষত ভারত-সহ দক্ষিণ এশিয়ায় বিপর্যয়-উত্তর হস্তক্ষেপকে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের অন্যতম বলে বিবেচনা করা হ'ত। একমাত্র এদিকে লক্ষ্য রেখেই তৈরি হ'ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, নীতি, কর্মসূচি। ভালো কথা এই যে অবস্থাটা বদলে গেছে এখন। গত দেড় দশক যাবৎ, ভারতে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার ধ্যানধারণা পালটে গেছে এবং নতুন নতুন অভিজ্ঞতার নিরিখে তা নিয়মিত পরিমার্জিত হচ্ছে।

২০১৫-এ সেনডাই চুক্তি সই হওয়ার পর, এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলির জন্য বিপর্যয় ঝুঁকি হ্রাস, যাতে প্রাক্-বিপর্যস্ত কর্মকাণ্ড প্রাধান্য পাবে— তার এক রোডম্যাপ ছকার জন্য ভারত ২০১৬-র নভেম্বরে অঞ্চলের দেশগুলির মন্ত্রী পর্যায়ের এক সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী দশ দফা কর্মসূচি তুলে ধরেন। এর আগে জাপানের সেনডাই শহরে ঝুঁকি কমানোর জন্য বিশ্ব রোডম্যাপ তৈরির লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলনে সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক ২০৩০-এ সায় দেয় ১৮৫-টির বেশি দেশ। ভারতও এই চুক্তিতে সামিল।

বিপর্যয়ের পর ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে সামিল হওয়াটা সবার বেশ চোখে পড়ে এবং সেজন্য এ কাজে সবাই বেশ আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসে। পক্ষান্তরে, বিপর্যয়ের জন্য প্রস্তুতি ও ঝুঁকি কমানোর বিষয় অনেকটা লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে যায় বলে এতে তেমন গা লাগাতে দেখা যায় না। বিশ্বজুড়ে বিস্তর চুক্তি ও ঘোষণা সত্ত্বেও কাজের কাজ হয়নি তেমন একটা। বিশ্বে বেশ কিছু সাফল্যের কাহিনী থেকে দেখা যায় বিপর্যয় মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতি নিলে যথেষ্ট সুফল মেলে। ভারতেও এর নজির আছে বইকি! ১৯৯৯-এ ওড়িশায় সুপার সাইক্লোনে মৃত্যু হয় ১৩ হাজারের বেশি মানুষের। সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছিল প্রচুর। ২০১৩-এ ঘূর্ণিঝড় পিলিন আছড়ে পড়ে ওই রাজ্যেই। তার তীব্রতা বা বেগও ছিল আগের সাইক্লোনটির মতোই। তা সত্ত্বেও পিলিনে জীবনহানি ঢের ঢের কমে দাঁড়ায় মাত্র ২২। ঘরবাড়ি ও অন্যান্য সম্পত্তির অবশ্য ক্ষতি হয়েছিল বিস্তর। ভারত এহেন ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়েও যেভাবে মৃতের সংখ্যা বহুল পরিমাণে কমাতে সক্ষম হয়েছিল তা বিশ্বে এক সেরা উপায় হিসেবে গণ্য হয়েছে। তামিলনাড়ুতে অধুনা ভারদা সাইক্লোনে মারা গেছে মাত্র ১৪ জন। যদিও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। তার আগে হুদহুদ ঘূর্ণিঝড়ের সময়েও লক্ষ্য করা গেছে একই ঘটনা। এসব থেকে স্পষ্ট প্রমাণ মেলে যে সক্ষমতা তৈরির জন্য আগে থেকে লগ্নির আন্তরিক প্রচেষ্টা চালালে প্রাণহানি কমে। এখন দেখতে হবে রাস্তাঘাট, সেতু, ঘরবাড়ি, বিদ্যুৎ পরিবহণ ব্যবস্থা, উৎপাদনশীল মূলধন ইত্যাদির ক্ষয়ক্ষতি কীভাবে এড়ানো যায়।

বিপর্যয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূলস্রোতে সামিল করা

আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও স্থানীয় স্তরে ঝুঁকি হ্রাসকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূলস্রোতে আনাটা এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কাজ অবশ্য বেশ জটিল, এক-আধটা নয়, এর চ্যালেঞ্জ গণ্ডা গণ্ডা। বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতাসম্পন্ন এক ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হলে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে অতীত থেকে।

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে জ্ঞান-অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করার দরকার আছে এখনও। সরকারের নীতি প্রণেতা ও প্রশাসনের সব স্তরে বিপর্যয় ব্যবস্থাপকদের মধ্যে এক বহুপোযোগী যোগাযোগ গড়ে তুলতে চাই এক সাধারণ প্ল্যাটফর্ম বা মঞ্চ।

এর মানে, কারিগরি সক্ষমতা, আগাম হুঁশিয়ারি ব্যবস্থা প্রবর্তন, সম্পদ পরিকল্পনা, বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জমির এলাকা নির্দিষ্ট করা এবং বিপর্যয় প্রতিরোধী নির্মাণ উপবিধি মেনে চলার জন্য সচেতনতা আনতে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনাগুলির মধ্যে সঙ্গতি আনা দরকার। এই লক্ষ্য মাথায় রেখে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন নতুন উদ্ভাবন, আগাম সতর্কতা জারি ব্যবস্থা, ক্ষমতা বাড়ানোর শরণ নেওয়া জরুরি এবং সেগুলিকে জাতীয়, রাজ্য ও ক্ষেত্রীয় স্তরের পবিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অধিকাংশ সাফল্যের কাহিনীতে, ভবিষ্যতে শিক্ষার জন্য কিছু সাধারণ মিল খুঁজে পাওয়া যায় যা কিনা বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার গোটা আখ্যান বদলে দিতে পারে। শুধুমাত্র ত্রাণ-পুনর্বাসন ইত্যাদি বিপর্যয়-উত্তর কর্মকাণ্ডে মনোযোগ দেওয়ার চেয়ে বিপর্যয় মোকাবিলার বন্দোবস্তে লগ্নি করাটা বেশি বিচক্ষণতার কাজ এবং এই শিক্ষা ভারতে অভিনব কিছু নয়। এর এক দৃষ্টান্ত হচ্ছে ১৯৫৬-এ গুজরাতের আনজারি ভূ-কম্প। সেই ভূ-কম্পের পর, শহরটির বিধ্বস্ত ঘরবাড়ির বাসিন্দাদের জন্য অন্য জায়গায় ভূ-কম্প প্রতিরোধক্ষম বাড়ি বানিয়ে দেওয়া হয়। আধা শতক পর, ২০০১-এ ভুজ ভূ-কম্পের ধাক্কায় গুঁড়িয়ে যায় আনজার শহরের বেশিরভাগ

ঘরবাড়ি। ১৯৫৬-এ নতুন জায়গায় তৈরি করে দেওয়া বাড়িগুলি কিন্তু টিকে যায় দিব্যি। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূলস্রোতে বিপর্যয় ঝুঁকিকে সামিল করার সুফলের এ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দুর্ভাগ্যবশত সময় চলে যেতে আমরাও ভুলে গেছি ব্যাপারটা। অতীতের এসব অভিজ্ঞতা নথিভুক্ত করে রাখা দরকার এবং তা থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সামনে অসহায়তা কাটানোর জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় স্তরে তা কাজে লাগানো চাই। গুজরাতে ২০০১-এ কচ্ছ ভূ-কম্পে, দীর্ঘ মেয়াদের পুনর্নির্মাণ কর্মসূচির মূলনীতি ছিল বিপর্যয় ঝুঁকি হ্রাসকে মূলস্রোতে টেনে আনা। বিপর্যয়ের পর আরও ভালোভাবে বানাও কর্মসূচির এক দৃষ্টান্তমূলক নজির সৃষ্টি করার দিকে তা এগিয়ে নিয়ে গেছে। এ জন্য এই কর্মসূচির বরাতে জুটেছে রাষ্ট্রসংঘের শিরোপাও এবং এই কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি মিলেছে আবিশ্ব।

বহু আর্থনীতিক ও আর্থিক সমীক্ষায় আছে বিপর্যয় ঝুঁকি হ্রাসের সুবিধা ও প্রয়োজন-এর বিবরণ। ঝুঁকি হ্রাসে বিনিয়োগ করলে বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি অনেকখানি কমতে পারে, গবেষণায় এটা দেখা সত্ত্বেও, ইউনেস্কোর এক হিসেবে বলা হয়েছে যে এখন দানখয়রাতি বাবদ বরাদ্দের প্রতি ১০০ ডলারের মধ্যে ঝুঁকি কমানো খাতে খরচ করা হয় মাত্র ৪ ডলার। পরিবেশের উপর মানুষের কাজকর্মের ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস এবং প্রাকৃতিক বিপত্তি থেকে অসহায় গরিব লোকজনকে রক্ষা করতে তাদের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আগামী দিনে বিশ্বের দারিদ্র্য দূর করার উদ্যোগে বিপর্যয় ঝুঁকি হ্রাস এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে গণ্য করা উচিত।

সেনডাই চুক্তি, ২০১৫-'৩০

সেনডাই চুক্তি হচ্ছে হিয়েগো ফ্রেম ওয়ার্ক, ২০০৫-'১৫-এর উত্তরসূরি। International Framework for action for the International decade for natural desaster reduction 1989, এবং The Yocohama strategie for a safer world : guidelines for natural desaster prevention, preparedness and metigation and its plan of action, 1994 এবং The international strategie for desaster reduction 1999-এর আওতায় কাজকর্মকে আরও জোরদার করতে হিয়েগো চুক্তির উদ্ভব হয়।

হিয়েগো চুক্তির অধীনে রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সব সংশ্লিষ্ট পক্ষের কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া নিশ্চিত করার ভিত্তিতে সেমডাই ফ্রেমওয়ার্ক প্রণীত হয় এবং শলাপরামর্শ ও আলোচনার সময় উল্লেখিত বেশ কিছু উদ্ভাবনমূলক চিন্তাভাবনা ঠাঁই করে নেয় এতে। বহু বিশেষজ্ঞের মতে, সেনডাই চুক্তিতে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা নয়, বরং বিপর্যয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বেশি গুরুত্ব দেওয়াটা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বদল। এছাড়া, প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যকৃত উভয় বিপত্তি এবং সেই সম্পর্কিত পরিবেশ, প্রযুক্তি এবং জৈব-বিপদ ও ঝুঁকির উপর মনোযোগ দিতে বিপর্যয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পরিসর বাড়ানো হয়েছে অনেকখানি। স্বাস্থ্যের বিষয়টিও যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে।

সেনডাই চুক্তি খুব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে : বিপর্যয় ঝুঁকি সম্পর্কে আরও সম্যক জ্ঞানগম্যি দরকার, অসহায়তা ও বিপদের ধরনধারণ ; জাতীয় প্ল্যাটফর্ম-সহ বিপর্যয় ঝুঁকি শাসন জোরদার করা ; বিপর্যয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দায়বদ্ধতা ; 'বিপর্যয়ের পর আরও ভালোভাবে বানাও' এর জন্য প্রস্তুতি ; স্বাস্থ্য পরিকাঠামো, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং কর্মস্থলের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতা ; আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব মজবুত করা ; আন্তর্জাতিক অর্থ প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে সহায়তা ও ঋণ।

নয়া জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সব ক্ষেত্র জুড়ে উন্নয়ন ক্রিয়াকাণ্ডে বিপর্যয় ঝুঁকি হ্রাসকে জুড়ে দিয়ে সমস্ত স্তরে বিপর্যয়ের মোকাবিলায় আমাদের দেশকে করে তুলবে তুখোড়। বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় বিশ্বের ধারা-রীতিনীতির দিকেও নজর থাকবে এই পরিকল্পনায়। বিপর্যয় ঝুঁকি কমানোর জন্য সেনডাই চুক্তি ২০১৫-'৩০-এর দৃষ্টিভঙ্গি জাতীয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ভারত এই চুক্তির এক শরিক।

উপসংহার

বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য, সহায়সম্পদের অভাব থাকা দেশগুলিতে উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিপর্যয়ের অভিঘাত হ্রাসে প্রয়োজনীয় লগ্নি খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিনিয়োগের জন্য ঝুঁকি সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকার চেয়ে ঝুঁকি বিষয়ে ওয়াকিবহাল হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটা হবে এক বিচক্ষণতা। বিপর্যয়প্রবণ অঞ্চলে কোনও প্রকল্পের পরিকল্পনায় সেই প্রকল্পের বিপর্যয় ঝুঁকি অডিট বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। সরকারি বা বেসরকারি যে কোনও লগ্নির ক্ষেত্রে উন্নয়নের সুফল রক্ষা ও বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার সামর্থ্য অর্জন প্রাথমিক নীতি হওয়া দরকার। বিপর্যয় ঝুঁকির ক্ষেত্রে আরও ব্যাপক ও জনগণকেন্দ্রিক নিবারণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। নীতি, পরিকল্পনা, স্ট্যান্ডার্ডের ডিজাইন বা নকশা ও রূপায়ণে সরকারের উচিত সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ, বিশেষত বেসরকারি ক্ষেত্রকে সহায়তা ও উৎসাহ জোগানো এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলা। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সবাইকে সামিল করার লক্ষ্যে মহিলাদের নেতৃত্বদানের ব্যবস্থা থাকা দরকার। সেই সঙ্গে এতে যুবা, শিশু, নাগরিক সমাজ, বিদ্বজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদের ব্যবস্থাপনা চর্চায় বিপর্যয় ঝুঁকিকে জুড়ে দিতে, সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি করতে এবং আরও ঘনিষ্ঠভাবে একযোগে কাজ করার জন্য সব রাষ্ট্রের উচিত বিজ্ঞান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আগ্রহী করা।❑

(লেখক 'জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান'-এর নির্বাহী অধিকর্তা। ইমেল : profsantosh@gmail.com)

WBCS - 2017 মেনস্

হার্ড ওয়ার্ক নয়, দরকার স্মার্ট ওয়ার্ক

জানুয়ারীর শেষে সম্ভবত চুকে যাচ্ছে প্রিলির পালা। তার কয়েকমাস পর মেনস্। প্রিলির মতো ২০০ নয়, এখানে প্রস্তুতি নিতে হবে ১২০০ বা ১৬০০ নম্বরের জন্য। সুতরাং অগোছালোভাবে পড়াশুনা করলে চলবে না। প্রস্তুতি নিতে হবে স্ট্র্যাটেজীক্যালি। কঠোর পরিশ্রম বা হার্ড ওয়ার্কের সঠিক বিকল্প হতে পারে স্মার্ট ওয়ার্ক। কিভাবে তা সম্ভব – সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন সামিম সরকার।

প্রিলি আদতে ছাটাই পর্ব। লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে থেকে কেটে ছেঁটে হাজার চারেক প্রার্থী ছাড়পত্র পায় মেনসে বসার। প্রিলিতে প্রাপ্ত নম্বর ক্যারি ফরোয়ার্ড হয় না, তাই প্রিলিতে শুধুমাত্র পাশ মার্ক পেলেই চলে। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে আসল লড়াই হয় মেনসে। মেনস হল প্রকৃত পক্ষে বাছাই পর্ব। এখানে এক নম্বরের ভগ্নাংশে নির্ধারিত হয় প্রার্থীর সাফল্য-ব্যর্থতা। WBCS অফিসার হওয়ার বাসনা থাকলে মেনস পরীক্ষাতেই নিশ্চিত করে নিতে হবে চাকরিটিকে। কেননা, ইন্টারভিউয়ের জন্য কিছু ফেলে রাখা উচিত হবে না। ইন্টারভিউ বড়ই আনপ্রেডিক্টেবল, সামান্য দশ পনের মিনিটে কিছু ভুলচুকের মূল্য দিতে হতে পারে সারা জীবন ধরে। মেনস ১৬০০ (C এবং D এর ক্ষেত্রে ১২০০) নম্বরের ম্যারাথন পরীক্ষা। কোন একটি পেপার খারাপ হয়ে গেলে শুধরে নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ ও সময় পাওয়া যায়, ইন্টারভিউয়ে যার স্কোপ একেবারেই নেই।

WBCS - এ নিজের প্রথম পছন্দের চাকরিটি পাওয়ার পূর্বশর্ত হল মেনসে সর্বাধিক নম্বর তুলে নেওয়া। তা করার জন্য সবার আগে প্রয়োজন সঠিক এবং যথাযথ একটি প্ল্যানিং বা স্ট্র্যাটেজী তৈরী করা। তারপর প্রয়োজন ওই স্ট্র্যাটেজীকে নিখুঁত ভাবে কাজে লাগানো। সঠিক পরিকল্পনা এবং তার যথার্থ রূপায়নের মাধ্যমেই আসতে পারে কাঙ্খিত সাফল্য। স্ট্র্যাটেজী বা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য মেনসের সিলেবাসটিকে ভালভাবে বুঝে নিতে হবে। কিন্তু সমস্যা হল, কম্পালসরি পেপারগুলির সিলেবাসের উল্লেখ থাকে নামমাত্র যার দ্বারা একটি ফিজিবল স্ট্র্যাটেজী তৈরী করা সম্ভব নয়। তাই ২০১৪, ২০১৫ এবং ২০১৬ এর প্রশ্নপত্র গুলিকে নিয়ে কাঁটাছেড়া করতে হবে, করতে হবে গভীর ভাবে বিশ্লেষণ। প্রশ্নগুলিকে বিশ্লেষণ করে সিলেবাসের একটি রূপরেখা তৈরী করতে হবে। সেই মতো নিতে হবে প্রস্তুতি। এরপর আসছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়টি— তোমার দীর্ঘ দিনের প্রস্তুতিকে সর্বোত্তমভাবে পরীক্ষার খাতায় নামিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে তোমার প্রতিনিধি হিসাবে PSC -র কাছে যাবে A4 সাইজের একটি OMR শীট। সুতরাং নিজের প্রস্তুতিকে ম্যাক্সিমাম নম্বরে কনভার্ট করার একমাত্র মাধ্যম হল OMR শীট। বহু পরীক্ষার্থী শুধু পড়েই যায় দিন রাত এক করে। কিন্তু মকটেস্ট বা মহড়া পরীক্ষা দেয় না। খ্যাতনামা অভিনেতা, খেলোয়াড় কিংবা শিল্পী সকলেই নিয়মিত অনুশীলন বা প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকেন, তবেই আসল মঞ্চে চোখ ধাঁধানো পারফরমেন্স করতে পারেন। কিন্তু আমরা, WBCS পরীক্ষার্থীরা, কি করে ভেবে নিই যে কোন অনুশীলন বা মকটেস্ট ছাড়া PSC -র আসল পরীক্ষায় বাজিমাত করবো। এটি চূড়ান্ত মূর্খামীরই নামান্তর। সুতরাং শুধু ঘন্টার পর ঘন্টা পড়ে গেলেই চলবে না, দরকার নিয়মিত মকটেস্ট দেওয়া। মকটেস্ট গুলি অবশ্যই স্ট্যান্ডার্ড এবং লেটেস্ট হবে। এ ধরনের মকটেস্ট একমাত্র অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনেই নেওয়া হয়। সাফল্যের জন্য নিয়মিত WBCS অফিসারদের সাথে পরামর্শ করা দরকার, তাদের নির্ধারিত পন্থায় প্রস্তুতি নিতে পারলে সাফল্য সহজসাধ্য হয়। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এমন এক সংস্থা যেখানে ক্লাস নেন মূলত সদ্য পাশ করা ব্রিলিয়ান্ট WBCS টপাররা। লক্ষাধিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম ১০ এর মধ্যে থাকা WBCS অফিসারদের গাইডেন্স একমাত্র এখানেই পাওয়া যায়। নোটস্, ক্লাস টেস্ট, মকটেস্ট তৈরী করেন সুতপা কর ম্যাডাম। সুতরাং একদিকে ভীষণ ভালো ক্লাসরুম গাইডেন্স এবং অপরদিকে উন্নত মানের নোটস ও মক টেস্টের যুগপৎ মেলবন্ধন ঘটেছে এখানে। এখন শুধু প্রয়োজন তোমাদের পরিশ্রম। হার্ড ওয়ার্ক নয়, স্মার্ট ওয়ার্ক। বাকিটুকু নির্দ্বিধায় অ্যাকাডেমিকের হাতে অর্পণ করতে পারো। কারণ অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন তোমাদের ভরসার মূল্য দিতে জানে।

সামিম সরকারের
প্রিলির কাট অফ সেমিনার

প্রিলির কাট অফ অ্যানালিসিস এবং মেনসের স্ট্র্যাটেজী নিয়ে আলোচনা করবেন **সৌভিক ঘোষ (WBCS-2015 তে প্রথম স্থানাধিকারী) এবং সামিম সরকার।** এটি আয়োজিত হবে কলেজস্ট্রীটে প্রিলি পরীক্ষার ঠিক পরের রবিবার। নাম নথিভুক্ত করুন-

এই নম্বরে 9038786000 আসন সীমিত।

রাজ্যসরকারের ৬,০০০ গ্রুপ-ডি নিয়োগের সম্পূর্ণ সিলেবাস অনুযায়ী এক কমপ্লিট গাইড বুক - সামিম সরকারের সম্পাদনায়

মিশন গ্রুপ ডি -২০১৭

বইটি প্রকাশিত হতে চলেছে

৩রা ফেব্রুয়ারী ২০১৭ ফোন ঃ **7031842001**

খুব অল্প কপি বাজারে ছাড়া হবে। বইটি পেতে হলে শীঘ্রই নিকটবর্তী বুক স্টলে অর্ডার দিন।

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন ✆ 9038786000 9674478644

হেড অফিস ঃ দ্য সেল্ফ কালচার ইন্সটিটিউট, ৫৩/৬ কলেজস্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার), কলকাতা - ৭০০০৭৩

Website : www.academicassociation.in ❋ Uluberia-9051392240 ❋ Barasat-9800946498 ❋ Berhampur-9474582569 ❋ Birati-9674447451 ❋ Siliguri-9474764635 ❋ Medinipur Town-9474736230

যোজনা ? ক্যুইজ

এবারের বিষয় : বিবিধ

১. স্বাস্থ্যের কারণে কোন রাজ্যসভা সদস্য গত ২৬ ডিসেম্বর পদত্যাগ করেন?

২. কোন দেশ পৃথিবীর কক্ষপথে অত্যাধুনিক আবহাওয়া উপগ্রহ ‘Himawari-9’ প্রেরণ করেছে?

৩. রেলমন্ত্রক বয়স্ক নাগরিকদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে আধার নম্বর ভিত্তিক টিকিট ক্রয় ব্যবস্থা চালু করতে মনস্থ করেছে। কবে থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে?

৪. বর্তমানে পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) পরিষদের প্রধান কে?

৫. দেশের কোন রাজ্য লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে সব ধরনের কর্মস্থলে রাতের শিফট্-এ মেয়েদের কাজ করার উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ তুলে নিয়েছে?

৬. ৩০ দিনের মধ্যে মহারাষ্ট্রের ‘শিরকি’ গ্রামটিকে পুরোপুরি নগদহীন লেনদেন ব্যবস্থার আওতায় আনতে কোন ব্যাংক উদ্যোগ নেয়?

৭. সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ২০১৬ সালের জন্য ‘Player of the year’ মনোনীত করেছে কোন ফুটবলারকে?

৮. গত ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৬-এ যে ‘জাতীয় গ্রাহক দিবস’ উদ্‌যাপিত হল, তার মূলভাবনা কী ছিল?

৯. গ্রাহকদের ডিজিটাল পদ্ধতিতে লেনদেন চালিয়ে লাকি ড্র-এর মাধ্যমে নগদ পুরস্কার জেতার সুযোগ করে দিতে গত ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৬-এ নীতি (NITI) আয়োগ কোন স্কিম চালু করেছে?

১০. ভারতের প্রথম নদী দ্বীপ-জেলা ‘মাজুলি’কে ২০২০ সালের মধ্যে দেশের প্রথম কার্বন নিরপেক্ষ জেলা হিসাবে গড়ে তোলার জন্য কোন রাজ্য একটি প্রকল্পের সূচনা করেছে?

১১. ভারত এবং পাকিস্তান যে ‘সিন্ধু জল চুক্তি’ প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে উদ্যোগী হয়েছে তার উপর ১২ ডিসেম্বর, ২০১৬-এ সাময়িক বিরতি চাপিয়েছে কোন সংগঠন?

১২. ভারত এবং ASEAN গোষ্ঠীর মধ্যে ২০২০ সাল নাগাদ বাণিজ্যের যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে তার পরিমাণ কত?

১৩. রাজস্থানের ‘রাজ্য পক্ষী’ (State bird) হিসাবে চিহ্নিত পাখির প্রজাতিটির অস্তিত্ব ক্রমশ বিপন্ন হয়ে উঠছে বলে তার সংরক্ষণে রাজ্য সরকার একটি প্রকল্প চালু করেছে। এই পক্ষী প্রজাতিটির নাম কী?

১৪. রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ (United Nations Security Council—UNSC) দক্ষিণ সুদানে সম্প্রতি শান্তি রক্ষা অভিযান ফের কত বছরের জন্য বাড়িয়েছে?

১৫. ওয়েব রত্ন শ্রেণি (Web Ratna Category)-র আওতায় কোন মন্ত্রক ‘ডিজিটাল ভারত পুরস্কার ২০১৬’ জিতেছে?

উত্তর :

১. মিঠুন চক্রবর্তী। ২. জাপান। ৩. পয়লা এপ্রিল, ২০১৭। ৪. কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। ৫. কর্ণাটক। ৬. ভারতীয় স্টেট ব্যাংক। ৭. জেজে লালপেখলুয়া। ৮. একান্তর গ্রাহক বিবাদ মীমাংসা (Alternate Consumer Disputes Redressl)। ৯. লাকি গ্রাহক যোজনা। ১০. অসম (প্রকল্পটির নাম ‘Sustainable Action for Climate Resilient Development in Majuli—SACRED, Majuli’)। ১১. বিশ্বব্যাংক। ১২. ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৩. Great Indian Bustard (হিন্দি নাম গোদাবন)। ১৪. ১ বছর। ১৫. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক।❑

যোজনা ? কুইজ

এবারের বিষয় : ভারতীয় সংবিধান

১. কোন ধারা অনুযায়ী ভারতীয় সংবিধান সংশোধন করা যায়?

২. ভারতীয় সংবিধানের কততম ধারায় আর্থিক জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা যায়?

৩. কত সালে ভোটাধিকার প্রাপ্তির বয়স ২১ থেকে কমিয়ে ১৮ করা হয়?

৪. কততম সংশোধনের মাধ্যমে আজ অবধি সবচেয়ে বৃহৎ মাত্রায় সংবিধান সংশোধন করা হয়?

৫. কোনও রাজ্যের নবনিযুক্ত রাজ্যপালকে কে শপথবাক্য পাঠ করান?

৬. জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৫৬ ধারা অনুসারে প্রথম বার কত সালে কেন্দ্রের শাসন বলবৎ করা হয়?

৭. ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনী পাস হওয়ার পর প্রথম কোন রাজ্য সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত গঠন করে?

৮. কোনও রাজ্যের বিধান পরিষদের আকার সেই রাজ্যের বিধানসভার কত অংশের বেশি হতে পারে না?

৯. ভারতীয় সংবিধান কোন তারিখ থেকে কার্যকরী হয়?

১০. দলত্যাগ বিরোধী আইন সংবিধানের কোন তপশিল (Schedule)-এর অন্তর্গত?

১১. কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (CAG) কতদিন মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হন?

১২. প্রথম অ-কংগ্রেসি প্রাদেশিক সরকার গঠিত হয় কোন রাজ্যে?

১৩. অর্থ কমিশন কতদিন অন্তর গঠন করা হয়?

১৪. ভারতের কোন রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রচলিত?

১৫. দেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

উত্তর :

১. ৩৬৮ নং ধারা। ২. ৩৬০ নং ধারা। ৩. ১৯৮৯ সালে। ৪. ৪২ তম। ৫. সংশ্লিষ্ট রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। ৬. ১৯৬৪ সালে। ৭. মধ্যপ্রদেশ। ৮. এক-তৃতীয়াংশ। ৯. ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০। ১০. দশম, ১৯৮৫ সালে যুক্ত করা হয়। ১১. ৬ বছর। ১২. কেরালায় (১৯৫৭ সালে)। ১৩. পাঁচ বছর। ১৪. গোয়া। ১৫. ১৯৫১-'৫২ সালে (১০০ দিন ধরে চলেছিল, প্রথম নির্বাচিত লোকসভা গঠিত হয় ১৯৫২ সালে)।❑

এবারের বিষয় : জ্ঞানপীঠ পুরস্কার

চলতি বছরে জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে সম্মানিত হলেন শঙ্খ ঘোষ। দু' দশক আগে জ্ঞানপীঠ পেয়েছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। কুড়ি বছরের ব্যবধানে এই সম্মান পেলেন আরেক বাঙালি।

প্রতি বছর 'ভারতীয় জ্ঞানপীঠ'-এর তরফে সাহিত্যের ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ একজন করে ভারতীয় লেখককে এই সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হয়। জ্ঞানপীঠের সূচনা হয় ১৯৬১ সালে। সংবিধানের অষ্টম তপশিলে যে ২২-টি ভারতীয় ভাষাকে রাখা হয়েছে তার মধ্যে যে কোনও একটি ভাষায় সাহিত্য চর্চা করেন এমন ভারতীয় লেখকরা এই সম্মান প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হন। এছাড়াও ইংরাজি ভাষায় লেখেন এমন ভারতীয় লেখকরাও এই পুরস্কারের জন্য যোগ্য হলেও এখনও পর্যন্ত এই ভাষায় লেখেন এমন কোনও সাহিত্যিক জ্ঞানপীঠ পাননি। ১৯৬৫ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত ভারতীয় সাহিত্যকদের তাদের সর্বোত্তম সহিত্য কীর্তির জন্য এই সম্মান জানানো হ'ত। পুরস্কার মূল্য ছিল নগদ এক লক্ষ টাকা। এছাড়াও দেওয়া হ'ত একটি ফলক এবং দেবী সরস্বতীর ব্রোঞ্জ নির্মিত একটি মূর্তি।

ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত বইগুলির মধ্যে থেকে বছরের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি বেছে নেওয়ার জন্য ১৯৬৩ সালের ১৬ মার্চ দিল্লিতে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার নির্বাচন কমিটির প্রথম বৈঠক বসেছিল। দশ সদস্যের কমিটির অন্যতম ছিলেন আর এক বিস্মৃতপ্রায় বাঙালি লেখক, 'বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব)'-এর প্রণেতা নীহাররঞ্জন রায়। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন কাকা কালেলকর, করণ সিং, আর. আর. দিবাকর, ভি. রাঘবন, বি. গোপাল রেড্ডি, হরেকৃষ্ণ মহতাব, রাম জৈন এবং লক্ষ্মী চন্দ্র জৈন। কমিটির সভাপতিত্ব করেন সম্পূর্ণানন্দ। ১৯২১ থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে প্রকাশিত বইগুলিকে প্রথম জ্ঞানপীঠ সম্মানের জন্য বিবেচনায় রেখেছিল কমিটি। সে যাত্রায় চূড়ান্ত পর্বে কাজি নজরুল ইসলামের নাম কমিটির বিবেচনায় থাকলেও শেষ পর্যন্ত প্রথম জ্ঞানপীঠ পেয়েছিলেন মালয়ালম লেখক জি. শঙ্করা কুরুপ। চূড়ান্ত পর্বে ঠাঁই পাওয়া অন্য দুই সাহিত্যিক হলেন কন্নড় ভাষার লেখক ডি. ভি. গুণ্ডাপ্পা এবং তেলেগু ভাষার বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণন। তাঁর কবিতা সংগ্রহ ওডাক্কুঝহাল (Odakkuzhal) (বাঁশের বাঁশি)-এর জন্য ১৯৬৬-র ১৯ নভেম্বর কুরুপের হাতে দিল্লিতে বিজ্ঞান ভবনে এক অনুষ্ঠানে জ্ঞানপীঠ সম্মান তুলে দেওয়া হয়। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫০ সালে।

১৯৮১ সালে জ্ঞানপীঠ পুরস্কারের অর্থমূল্য বাড়িয়ে দেড় লক্ষ টাকা করা হয় এবং ২০১৫-এ তা আরও অনেকখানি বাড়িয়ে ১১ লক্ষ করা হয়। ২৩-টি ভাষার সাহিত্যকর্মকে বিবেচনার যোগ্য বলে ধরা হলেও এযাবৎকালীন তার মধ্যে ১৫-টি ভাষার সাহিত্যকর্মকেই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি, দশবার পুরস্কার দেওয়া হয়েছে হিন্দিতে। তার পরে কন্নড় ভাষায়, আটবার। তৃতীয় স্থানে রয়েছে বাংলা। এযাবৎকালীন মোট ছয়জন বাঙালি সাহিত্যিক জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন। চলতি বছর পর্যন্ত যে ৫৭-জন সাহিত্যিক জ্ঞানপীঠ সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন তার মধ্যে মহিলা সাহিত্যিকের সংখ্যা মাত্র ৭। ১৯৭৬ সালে বাঙালি ঔপন্যাসিক আশাপূর্ণা দেবী জ্ঞানপীঠ সম্মান পান প্রথম মহিলা সাহিত্যিক হিসাবে। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ত্রয়ী 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা' এবং 'বকুল কথা'-র প্রথম উপন্যাস ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-র জন্য। আরেক বাঙালি মহিলা সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী ১৯৯৬ সালে জ্ঞানপীঠ পান।

উল্লেখ্য, প্রথমবার চূড়ান্ত পর্বে স্থান পেয়েও জ্ঞানপীঠ সম্মান কাজি নজরুলের ভাগ্যে না জুটলেও তার ঠিক পরের বছরই বাংলা ভাষা সম্মানিত হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পুরস্কার পেলেন তার বিখ্যাত 'গণদেবতা' বইটির জন্য। বাংলা ভাষায় জ্ঞানপীঠ সম্মানিত বাকি দু'জন হলেন কবি বিষ্ণু দে এবং কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ১৯৭১ সালে 'স্মৃতি সত্ত্বা ভবিষ্যৎ' বইটির সূত্রে কবি বিষ্ণু দে এই সম্মান পান আর কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় জ্ঞানপীঠ সম্মানিত হন ১৯৯১ সালে।

চুরাশি বছর বয়সেও শঙ্খ ঘোষের কলম সমান তাজা। কয়েক মাস আগেই বেরিয়েছে তাঁর সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ 'শুনি শুধু নীরব চিৎকার'। আর এই ডিসেম্বরেই প্রকাশিত হয়েছে এক গদ্যগ্রন্থও 'নিরহং শিল্পী'।

গত দু'-তিন বছর ধরেই কবি শঙ্খ ঘোষের নাম জ্ঞানপীঠের জন্য প্রবলভাবে আলোচিত। শুধু কবি নন, কবিতা নিয়ে নির্ভর প্রবন্ধও লেখেন। ১৯৭৭ সালে 'মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়'-এর জন্য পেয়েছেন 'নরসিং দাস' পুরস্কার। ওই বছরই 'বাবরের প্রার্থনা'-র জন্য পান 'সাহিত্য একাডেমি' পুরস্কার। ১৯৮৯ সালে 'ধূম লেগেছে হৃদ কমলে'-র জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত করে। কবিতা সংগ্রহ 'গন্ধর্ব কবিতা গুচ্ছ'-এর জন্য সরস্বতী সম্মান পান। ১৯৯৯ সালে 'রক্তকল্যাণ' অনুবাদের জন্য দ্বিতীয়বার 'সাহিত্য একাডেমি' পুরস্কার পান। ওই বছরই বিশ্বভারতী তাকে দেশিকোত্তম উপাধিতে ভূষিত করে। ২০১১-তে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধি দেয়। আর ২০১৬-এ পেলেন জ্ঞানপীঠ। কবির অন্যান্য বিখ্যাত সাহিত্য কীর্তির মধ্যে রয়েছে 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে', 'এ আমির আবরণ', 'উর্বশীর হাসি', 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ', 'আদিম লতা-গুল্মময়', 'কবির অভিপ্রায়' ইত্যাদি।

যোজনা ||| নোটবুক

জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে সম্মানিত সাহিত্যিকরা

বছর	প্রাপক	ভাষা
১৯৬৫	জি. শঙ্করা কুরুপ	মালয়ালাম
১৯৬৬	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	বাংলা
১৯৬৭†	উমাশঙ্কর যোশী	গুজরাটি
১৯৬৭	কুপ্পালি ভেঙ্কটাপ্পা পুটাপ্পা 'কুভেমপু'	কন্নড়
১৯৬৮	সুমিত্রানন্দন পন্থ	হিন্দি
১৯৬৯	ফিরাক গোরখপুরি	উর্দু
১৯৭০	বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণন	তেলেগু
১৯৭১	বিষ্ণু দে	বাংলা
১৯৭২	রামধারি সিং 'দিনকর'	হিন্দি
১৯৭৩†	ডি. আর. বেন্দ্রে	কন্নড়
১৯৭৩†	গোপীনাথ মহান্তি	ওড়িয়া
১৯৭৪	বিষ্ণু সখারাম খান্দেকর	মারাঠি
১৯৭৫	অকিলান	তামিল
১৯৭৬	আশাপূর্ণ দেবী	বাংলা
১৯৭৭	কে. শিবরাম কারান্থ	কন্নড়
১৯৭৮	শচ্চিদানন্দ ব্যাৎসায়ন	হিন্দি
১৯৭৯	বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য	অসমিয়া
১৯৮০	এস. কে. পোট্টেককাট্ট	মালয়ালম
১৯৮১	অমৃতা প্রীতম	পাঞ্জাবি
১৯৮২	মহাদেবী ভার্মা	হিন্দি
১৯৮৩	মস্তি ভেঙ্কটেশআয়েঙ্গার	কন্নড়
১৯৮৪	থাকাঝি শিবশঙ্করা পিল্লাই	মালয়ালম
১৯৮৫	পান্নালাল পটেল	গুজরাটি
১৯৮৬	শচীদানন্দ রাউট্রে	ওড়িয়া
১৯৮৭	বিষ্ণু বর্মন শিরওয়াদকর 'কুসুমাগরাজ'	মারাঠি
১৯৮৮	সি. নারায়ণন রেড্ডি	তেলেগু
১৯৮৯	কুর্‌রাতুলান হায়দর	উর্দু
১৯৯০	বিনায়ক কৃষ্ণ গোকাক	কন্নড়

বছর	প্রাপক	ভাষা
১৯৯১	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	বাংলা
১৯৯২	নরেশ মেহেতা	হিন্দি
১৯৯৩	সীতাকান্ত মহাপাত্র	ওড়িয়া
১৯৯৪	ইউ. আর. অনন্তমূর্তি	কন্নড়
১৯৯৫	এম. টি. বাসুদেবন নায়ার	মালায়ালম
১৯৯৬	মহাশ্বেতা দেবী	বাংলা
১৯৯৭	আলি সর্দার জাফরি	উর্দু
১৯৯৮	গিরিশ কারনাড	কন্নড়
১৯৯৯†	নির্মল ভার্মা	হিন্দি
১৯৯৯†	গুরদয়াল সিং	পাঞ্জাবি
২০০০	মামনি রাইসম গোস্বামী	অসমিয়া
২০০১	রাজেন্দ্র শাহ	গুজরাতি
২০০২	জয়াকান্তন	তামিল
২০০৩	বিন্দা কারান্দিকর	মারাঠি
২০০৪	রহমান রাহি	কাশ্মীরি
২০০৫	কুওঁয়ার নারায়ণ	হিন্দি
২০০৬	রবীন্দ্র কেলেকার	কোঙ্কনি
২০০৬	সত্যব্রত শাস্ত্রী	সংস্কৃত
২০০৭	ও. এন. ভি. কুরুপ	মালয়ালম
২০০৮	আখলাক মহম্মদ খান 'শাহরিয়ার'	উর্দু
২০০৯	অমরকান্ত	হিন্দি
২০০৯	শ্রী লালশুক্লা	হিন্দি
২০১০	চন্দ্রশেখর কামবারা	কন্নড়
২০১১	প্রতিভা রায়	ওড়িয়া
২০১২	রাভুরি ভরদ্বাজ	তেলেগু
২০১৩	কেদারনাথ সিং	হিন্দি
২০১৪	বালাচন্দ্র নেমাডে	মারাঠি
২০১৫	রঘুবীর চৌধুরি	গুজরাতি
২০১৬	শঙ্খ ঘোষ	বাংলা

যোজনা ডায়েরি

(২৩ নভেম্বর—২০ ডিসেম্বর, ২০১৬)

আন্তর্জাতিক

● **নতুন মার্কিন বিদেশসচিব টিলারসন :**

নতুন মার্কিন বিদেশসচিব হচ্ছেন বিশ্বের নামজাদা তেল সংস্থা 'এক্সনমবিল'-এর চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার (সিইও) রেক্স টিলারসন। ২০১৩ সালে যাকে বিদেশি নাগরিকদের জন্য সর্বোচ্চ সম্মান 'অর্ডার অফ ফ্রেন্ডশিপ' দিয়েছিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন। টিলারসনও ট্রাম্পের মতো রাজনীতির ছায়াও মাড়াননি এর আগে। 'এক্সনমবিল'-এর সিইও হিসেবে চষে বেড়িয়েছেন ইউরেশিয়ার দেশগুলি। প্রায় গোটা মধ্যপ্রাচ্যই। রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গেও সম্পর্কের উন্নতি চাইছেন ভাবী মার্কিন প্রেসিডেন্ট। আগাপাশতলা ব্যবসায়ী ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্যকে যে তার 'তেলের ব্যবসার অংশীদার' করতে চাইছেন, টিলারসনের মতো 'অয়েল টাইকুন'-কে বিদেশসচিবের মতো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে সেই ইঙ্গিতই দিয়ে দিলেন ভাবী মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

এদিকে হোমল্যান্ড সিকিউরিটির সচিব হিসেবে জেনারেল জন এফ কেলিকে বেছে নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট-ইলেক্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। স্পষ্টভাষী এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে জনপ্রিয় জেনারেল কেলি আমেরিকার সাদার্ন কম্যান্ডের দায়িত্বে ছিলেন। যার জন্য তাকে কিউবার গুয়ান্তামো বে-র সামরিক জেলের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। কেলিকে নিয়ে মোট তিনজন জেনারেল এত গুরুত্বপূর্ণ পদ পেলেন। প্রতিরক্ষা সচিবের পদে তিনি বেছেছেন জেনারেল জেমস এন ম্যাটিসকে আর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে ট্রাম্পের পছন্দ লেফটেন্যান্ট জেনারেল মাইকেল টি ফ্লিন।

'কান্ট ইজ নট অ্যান অপশন : মাই আমেরিকান স্টোরি'—চার বছর আগে বইটি লিখেছিলেন সাউথ ক্যারোলাইনার দু'বারের গভর্নর নিকি হ্যালি। ট্রাম্পের ক্যাবিনেটে প্রথম ভারতীয়-বংশোদ্ভূত এবং প্রথম মহিলা-মুখ। ৪৪ বছর বয়সী নিকি এবার রাষ্ট্রপুঞ্জে মার্কিন দূতের দায়িত্বভার সামলাবেন। ২০১১-এ সাউথ ক্যারোলাইনার গভর্নর থেকে ২০১৬-এ রাষ্ট্রপুঞ্জে মার্কিন দূত। জন্ম সাউথ ক্যারোলাইনার ব্যামবার্গে। নাম রাখা হয়েছিল নিমরাতা রনধাওয়া। ১৯৯৬ সালে বিয়ে মাইকেল হ্যালির সঙ্গে।

● **নয়া পাক সেনাপ্রধান বাজওয়া :**

পাকিস্তানের পরবর্তী সেনাপ্রধান হিসেবে লেফটেন্যান্ট কোমার জাভেদ বাজওয়াকে বেছে নিলেন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ। বাজওয়া পাক সেনার ইন্সপেক্টর জেনারেল, ট্রেনিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশান পদে ছিলেন। এছাড়াও সেনার ১০ কর্পস-এর দায়িত্ব ছিল বাজওয়ার হাতেই। এটি পাক সেনার সব চেয়ে বড়ো কর্পস। নিয়ন্ত্রণরেখার দায়িত্বে আছে এই কর্পস। আগের সেনাপ্রধান রাহিল শরিফ অবসর নিয়েছেন গত ২৯ নভেম্বর। তবে এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ছিল তীব্র। পাক সেনা ও প্রশাসনিক মহলে চারটি নাম ঘোরাঘুরি করছিল। বয়সের দিক থেকে এগিয়েছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল জুবাইর মাহমুদ হায়াত। তিনি এখন চিফ অফ জেনারেল স্টাফ। বাজওয়া দীর্ঘ দিন নিয়ন্ত্রণরেখা ও কাশ্মীরের দায়িত্বে ছিলেন। ভারত-পাক সম্পর্ক যে দিকে গড়াচ্ছে তাতে কাশ্মীর সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোক শরিফের দরকার পড়বে। সেই সূত্রেই হয়তো বাজওয়াকে বাছলেন তিনি। বাজওয়া বালোচ রেজিমেন্ট থেকে কাজ শুরু করেছিলেন। জেনারেল আয়ুব খান, জেনারেল আসলাম বেগ, জেনারেল কিয়ানি-র পরে এ নিয়ে এই রেজিমেন্ট থেকে চতুর্থ ব্যক্তি হিসেবে পাক সেনার দায়িত্ব নিলেন বাজওয়া।

● **নতুন আইএসআই প্রধান নাভেদ মুখতার :**

পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর প্রধান রিজওয়ান আখতারকে সরিয়ে দিলেন নয়া পাক সেনাপ্রধান কোমার জাভেদ বাজওয়া। আখতারকে ন্যাশনাল ডিফেন্স ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। আইএসআই-এর নয়া প্রধানের নাম লেফটেন্যান্ট জেনারেল নাভেদ মুখতার।

● **পাঁচ বছরের ভিসা পাবেন বাংলাদেশিরা :**

বাংলাদেশের নাগরিকদের শীঘ্রই ৫ বছর মেয়াদি ভিসা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকায় ভারতের হাইকমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। বাংলাদেশিদের ভারতীয় ভিসা পাওয়া নিয়ে সমস্যার বিষয়টি নিরসনে দিল্লি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। বাংলাদেশি নাগরিকরা এখন সহজেই পরিবার-সহ ভিসা পেয়ে

যে কোনও প্রয়োজনে ভারতে আসতে পারবেন। আর শুধু ১ বছর নয়, এখন ৫ বছরের মাল্টি-এন্ট্রি ভিসাও তাদের দেওয়া হবে।

● **২০ বছরের মধ্যে অর্ধেক পৃথিবী অপুষ্টির কবলে, সতর্কবার্তা রাষ্ট্রপুঞ্জের :**

আগামী ২০ বছরের মধ্যেই গোটা পৃথিবী জুড়ে মহামারীর রূপ নিতে চলেছে অপুষ্টি। রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (ইউএনএফএও) তরফে পয়লা ডিসেম্বর এ কথা জানানো হয়েছে। অপুষ্টির সঙ্গে যুঝতে কোন পথে এগোনো দরকার, তা নিয়ে আলোচনা করতে সম্মেলন আয়োজিত হয়েছিল ইতালির রোমে। সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের সরকারি প্রতিনিধিদের বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, অপুষ্টি রুখতে অবিলম্বে যদি সরকারগুলি সক্রিয় না হয়, তা হলে এর মহামারীর আকার নেওয়া আটকানো যাবে না। সমীক্ষা বলছে, এই মুহূর্তে পৃথিবীর জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ অপুষ্টিতে আক্রান্ত। ৮০ কোটি মানুষ অনাহারক্লিষ্ট, না খেয়ে বা এক বেলা খেয়ে দিন কাটছে তাদের। আর ১৯০ কোটি মানুষ স্থূলতা বা অতিরিক্ত ওজনের শিকার, যে স্থূলতা আসলে বেহিসেবি খাদ্যগ্রহণ বা উপযুক্ত পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যতালিকার অভাবজনিত। অর্থাৎ, দু'ধরনের অপুষ্টি মিলিয়ে এই মুহূর্তে প্রায় ২১০ কোটি মানুষ অপুষ্টির শিকার; আর পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ৭৫০ কোটির আশেপাশে।

রোমে আয়োজিত আন্তর্জাতিক পুষ্টি সম্মেলনে ইউএনএফএও-র মহানির্দেশক হোসে গ্রাজিয়ানো দ্য সিলভা তার ভাষণে বলেছেন, "সকলের পুষ্টি সুনিশ্চিত করার বিষয়টিকে একটি রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতা হিসেবেই দেখতে হবে।" এই মুহূর্তে পৃথিবীতে পুষ্টি সংক্রান্ত সমস্যা যতটা রয়েছে, তার জন্য প্রতি বছর বিশ্ব অর্থনীতি সাড়ে তিন লক্ষ কোটি ডলার ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এখনই রাষ্ট্রগুলি সতর্ক না হলে এই ক্ষতি আরও অনেক বাড়তে চলেছে বলে রাষ্ট্রপুঞ্জের তরফে সতর্ক করা হয়েছে।

● **সড়ক যাত্রা চুক্তি নিয়ে ভুটানের আপত্তি :**

বাংলাদেশ-ভুটান-ইন্ডিয়া-নেপালের (বিবিআইএন) মোটর ভেহিকেল চুক্তির পথে বাধা পড়ল। চুক্তিটি ভুটান-এর সংসদ সোংডুর উচ্চকক্ষে পেশ করা হয়েছিল অনুমোদনের জন্য। আলোচনার পর ভোটাভুটি হয়। ২০ সদস্যের মধ্যে পক্ষে ভোট পড়ে মাত্র দু'টি। বিপক্ষে ১৩, অনুপস্থিত ৫। ভুটান ছাড়পত্র না দিলে চুক্তিটি কার্যকর করা সম্ভব নয়। চার দেশের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগের তথা অর্থনৈতিক-বাণিজ্যিক বিকাশের সম্ভাবনা অতএব বিশ বাঁও জলে। আপত্তির কারণ মূলত পরিবেশগত। প্রসঙ্গত, পরিবেশ নিয়ে ভুটানের ভাবনার কারণও আছে। বিশ্বের একমাত্র 'কার্বন সিঙ্ক' রাষ্ট্র ভুটান। ভুটান যত কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে ছাড়ে তার থেকে বেশি গ্রহণ করে। ভুটান সার্কের সদস্য হওয়ার পর প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সমন্বয় বাড়িয়েছে। সার্কের স্বার্থেই মোটর ভেহিকেলস চুক্তিটি অপরিহার্য। ভুটানের আর্থিক উন্নয়নের জন্যও তা দরকার।

● **সরে দাঁড়ালেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জন কি :**

সরে দাঁড়ালেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জন কি। নিজের দলের নেতা হিসেবে সদ্য পূর্ণ করেছেন দশ বছরের মাইলস্টোন। গত ৬ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে অবসর নেওয়ার কথা নিজেই ঘোষণা করেন। ২০০৮ সালে প্রথমবার নির্বাচিত হয়ে নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসেছিলেন ন্যাশনাল পার্টির নেতা জন। গত ১২ ডিসেম্বর ন্যাশনাল পার্টির এমপি-রা বৈঠকে বসেন পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীর নাম ঠিক করতে। উপ-প্রধানমন্ত্রী বিল ইংলিশকেই নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বেছে নেওয়া হয়। তবে প্রধানমন্ত্রিত্ব ছাড়লেও এখনই এমপি-র পদ থেকে সরছেন না জন। কারণ তা হলে এখনই দেশে উপ-নির্বাচনের আয়োজন করতে হ'ত। তাই পার্লামেন্টের সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ না করার এই সিদ্ধান্ত।

● **গণভোটে হেরে ইস্তফা ইতালির প্রধানমন্ত্রীর :**

৬৮ বছরের পুরনো সংবিধান সংশোধন করতে গণভোটের ব্যবস্থা করেছিলেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী মাত্তেও রেনজি। কিন্তু সেই ভোটেই হেরে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। ইতালির ৭০ শতাংশ মানুষ এই গণভোটে সামিল হয়েছিলেন। ব্রেক্সিটের মতো এ দেশেও তৈরি হয়েছিল 'ইয়েস' আর 'নো' পন্থীর মতো দুই গোষ্ঠী। কিন্তু ৬০ শতাংশ ইতালীয় 'নো' ভোট দিয়েছেন। অর্থাৎ তারা চান না, দেশের সংবিধান সংশোধিত হোক। সংবিধান সংশোধন করার পিছনে রেনজির আসল উদ্দেশ্য ছিল, পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ, সেনাটোর সদস্য সংখ্যা ছেঁটে ফেলা। ৩১৫ জনের উচ্চকক্ষে মাত্র একশো সদস্য রাখার পরিকল্পনা ছিল ইতালীয় প্রধানমন্ত্রীর। প্রসঙ্গত, ইতালির নতুন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন পাওলো জেন্তিলোনি।

● **'টাইম'-এর বর্ষসেরা ট্রাম্প, 'ফোর্বস্'-এ পুতিন :**

দুনিয়াখ্যাত 'টাইম' ম্যাগাজিনের পাঠকদের বিচারে ডনাল্ড ট্রাম্পই হলেন 'পারসন অফ দ্য ইয়ার'। দ্বিতীয় স্থানে সদ্যসমাপ্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজিত ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিলারি ক্লিন্টন। যদিও তার আগের সপ্তাহের শেষেও প্রথম স্থানের দাবিদার হিসাবে ট্রাম্পের চেয়ে অন্তত ১৮ শতাংশ ভোটে এগিয়ে ছিলেন ২০১৪ সালে 'টাইম'-এর পাঠকদের বিচারে 'পারসন অফ দ্য ইয়ার' ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

অন্যদিকে, ফোর্বসের বিচারে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এই নিয়ে পর পর চারবার তিনি প্রথম স্থান ধরে রাখলেন। ফোর্বস ম্যাগাজিনের সমীক্ষা অনুযায়ী, দ্বিতীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প এবং নবম স্থানে রয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

● **দক্ষিণ কোরিয়ায় ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট পার্ক :**

গত ৯ ডিসেম্বর ক্ষমতাচ্যুত করা হল দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট

পার্ক কিউয়েন এ-কে। মূলত দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণের অভিযোগ রয়েছে দেশের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট পার্কের বিরুদ্ধে। দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় সংসদে ভোটাভুটিতে ২৩৪-টি ভোট প্রেসিডেন্ট পার্ককে ইমপিচমেন্ট-এর পক্ষে পড়ে। বিপক্ষে যায় ৫৬-টি ভোট। ছ'জন অনুপস্থিত ছিলেন। ইমপিচ করার পক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পড়ায় প্রেসিডেন্ট পার্ককে সরে যেতে হয়। তবে আপাতত ক্ষমতা থেকে সরানো হলেও তার সরকারকে ফেলে দেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে একমাত্র দেশের সাংবিধানিক আদালত। ১৮০ দিনের মধ্যে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আদালতকে। পার্কের সরকার পড়ে গেলে ষাট দিনের মধ্যে দেশে আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে হবে। সাসপেন্ড হওয়া প্রেসিডেন্টের হয়ে অস্থায়ীভাবে কাজ চালাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী হোয়াং কিও-আন।

● **ভারতকে 'প্রধান প্রতিরক্ষা সহযোগী' মানল আমেরিকা :**

ভারতকে নিজেদের 'প্রধান প্রতিরক্ষা সহযোগী' হিসেবে মান্যতা দিল আমেরিকা। প্রতিরক্ষা নিয়ে গত ৯ ডিসেম্বর মার্কিন কংগ্রেসে '২০১৭ ন্যাশনাল ডিফেন্স অথোরাইজেশন অ্যাক্ট' পাস হয়। এই বিলেই ভারতকে 'প্রধান প্রতিরক্ষা সহযোগী' হিসেবে মেনে নেওয়ার কথা উল্লিখিত ছিল। ভোটাভুটিতে ৯৯-টির মধ্যে ৯২-টি ভোটই পড়ে নয়াদিল্লির পক্ষে। এর আগে কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ অর্থাৎ হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভস-এ বিলটি পাস হয়েছিল ৩৭৫-৩৪ ভোটের ব্যবধানে। ১৮০ দিনের মধ্যে এ নিয়ে কংগ্রেসে রিপোর্ট পেশ করবেন মার্কিন বিদেশসচিব এবং প্রতিরক্ষাসচিব। উল্লেখ্য, বিল পাস হওয়ার দিনই নয়াদিল্লির নর্থ ব্লকে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পর্রীকরের সঙ্গে বৈঠক করেন আমেরিকার বিদায়ী প্রতিরক্ষাসচিব অ্যাস্টন বি কার্টার।

● **বিশ্ব জুড়ে সামরিক খাতে বরাদ্দে ভারত চতুর্থ স্থানে :**

ষষ্ঠ স্থানে ছিল। এক লাফে উঠে এসেছে চতুর্থ স্থানে। রাশিয়াকে এবং সৌদি আরবের মতো ধনকুবের রাষ্ট্রও ভারতের পিছনে। প্রতিরক্ষা বা সামরিক খাতে কোন দেশের বরাদ্দ কত? ২০১৬ সালের হিসেব প্রকাশ করেছে প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক সমীক্ষক সংস্থা আইএইচএস জেন'স। গোটা বিশ্বেই সামরিক ব্যয় লাফিয়ে বেড়েছে গত দু'এক বছরে। প্রতিরক্ষা খাতে খরচের প্রশ্নে আমেরিকা সবচেয়ে এগিয়ে। ২০১৬ সালে ৬২ হাজার ২০০ কোটি ডলারের কিছু বেশি অর্থ প্রতিরক্ষা খাতে খরচ করেছে আমেরিকা। ১৯ হাজার ১৭৫ কোটি ডলার সামরিক খাতে বরাদ্দ করে দ্বিতীয় স্থানে চিন। তৃতীয় ব্রিটেনের বরাদ্দ ছিল ৫৩৮০ কোটি ডলারের বেশি। আর প্রায় ৫০৭০ কোটি ডলার বরাদ্দ করে চতুর্থ স্থানে ভারত। সমীক্ষকরা বলছেন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমীকরণ এবং আঞ্চলিক বিবাদকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা সবচেয়ে বেশি এশিয়ায়। তাই এই মহাদেশেই গত এক বছরে সবচেয়ে বেশি বেড়েছে প্রতিরক্ষা বরাদ্দ।

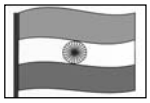

জাতীয়

- জয়ললিতার মৃত্যুর পর তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন ওট্টাকারাথিভার পনীরসেলভম এবং এডিএমকে-র সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেলেন শশিকলা নটরাজন।
- বিচারপতি জে এস খেহ্‌র হবেন তার উত্তরসূরি, জানিয়ে দিলেন দেশের প্রধান বিচারপতি টি এস ঠাকুর। ৪ জানুয়ারি শপথগ্রহণ।
- গত ৮ ডিসেম্বর এক মামলার রায় দিতে গিয়ে 'তিন তালাক' প্রথাকে অসাংবিধানিক আখ্যা দেয় ইলাহাবাদ হাইকোর্ট। একই সঙ্গে হাইকোর্টে জানিয়ে দেয়, কোনও পার্সোনাল ল' বোর্ডই সংবিধানের উর্ধ্বে নয়।

● **সুইস ব্যাংকের তথ্য সংক্রান্ত চুক্তি সই :**

গত ২২ নভেম্বর সুইৎজারল্যান্ডের সঙ্গে 'অটোমেটিক এক্সচেঞ্জ অফ ইনফর্মেশন' চুক্তি সই হওয়ায় ২০১৯ সাল থেকে ওই দেশের ব্যাংকে ভারতীয়দের নতুন অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য পাবে দিল্লি। অর্থ মন্ত্রকের দাবি, ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে সুইস ব্যাংকে ভারতীয়রা যেসব অ্যাকাউন্ট খুলবেন, সেগুলিতে লেনদেনের তথ্য সরাসরি হাতে পাবে ভারত। প্রথমবার তথ্য মিলবে ২০১৯-এর সেপ্টেম্বরে। তবে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরের আগের অ্যাকাউন্টের খুঁটিনাটি দিল্লি আপাতত পাবে না বলে জানিয়েছে ইউরোপীয় দেশটি। প্রসঙ্গত, ৬ জুন জেনিভায় সুইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আলোচনা করেন করফাঁকি দিয়ে সুইস ব্যাংকে লুকিয়ে রাখা টাকার তথ্য পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে।

● **প্রেক্ষাগৃহে জাতীয় সঙ্গীত বাধ্যতামূলক, রায় সুপ্রিম কোর্টের :**

নাগরিকদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ এবং দেশভক্তি ছড়িয়ে দিতে গত ৩০ নভেম্বর সমস্ত সিনেমা হল এবং মাল্টিপ্লেক্সে ছবি শুরুর আগে বাধ্যতামূলকভাবে জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর নিদান দিল সর্বোচ্চ আদালত। জাতীয় সঙ্গীত চলাকালীন প্রতিটি দর্শককে উঠে দাঁড়াতে হবে বলেও জানানো হয়েছে ওই নির্দেশে। তাছাড়া, জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর সময় বড়পর্দায় জাতীয় পতাকার প্রদর্শন করতে হবে। এই রায়ের ১০ দিনের মধ্যেই দেশ জুড়ে সমস্ত সিনেমা হল-মাল্টিপ্লেক্সে এই নির্দেশ কার্যকর করা হয়। জাতীয় সঙ্গীত বিষয়ক একটি জনস্বার্থ মামলার সূত্রে টেলিভিশন ও বিজ্ঞাপনী প্রচারে জাতীয় সঙ্গীতের অপব্যবহার রুখতে শীর্ষ আদালতের কাছে আবেদন করেন ভোপালের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্ণধার শ্যামনারায়ণ চৌসকি। তার আবেদনের জবাবেই বিচারপতি দীপক মিশ্র এবং বিচরপতি অমিতাভ রায়ের বেঞ্চ এই নির্দেশ দেয়। মামলার পরবর্তী শুনানি ২০১৭ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি।

বস্তুত, ১৯৬২-র ভারত-চিন যুদ্ধের পর থেকে ছবি শেষ হওয়ার পরে জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর চলন শুরু হয়। ষাট এমনকী সত্তর দশকেও তা বজায় ছিল। কিন্তু ছবি শেষ হতেই বেশিরভাগ দর্শক হল ছেড়ে চলে যেতেন বলে ধীরে ধীরে এই রেওয়াজ উঠে যায়।

২০০৩ সাল থেকে মহারাষ্ট্রের প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা শুরুর আগে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। দেশের সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এবারে ছবির আগেই জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হচ্ছে। কোর্টের নির্দেশ, জাতীয় সঙ্গীত চলাকালীন প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ ও প্রস্থানের দরজা বন্ধ রাখতে হবে। যাতে কোনও ব্যাঘাত না ঘটে।

● **হাজি আলিতে মেয়েদের সমান প্রবেশাধিকার কার্যকর :**

দীর্ঘ পাঁচ বছরের আইনি লড়াইয়ের পরে গত ২৯ নভেম্বর অবশেষে মুম্বইয়ে আরবসাগরের উপরে বিখ্যাত হাজি আলি দরগার কেন্দ্রস্থলে প্রবেশ করলেন আন্দোলনকারী ভারতীয় মুসলিম মহিলা সংগঠনের প্রায় ৮০ জন প্রতিনিধি। হাজি আলি দরগায় দীর্ঘদিন পর্যন্ত সর্বত্র মেয়েদের যাতায়াতের অধিকার ছিল। কিন্তু ২০১১ সালে হঠাৎই দরগার ট্রাস্ট সিদ্ধান্ত নেয়, দরগার একেবারে কেন্দ্রস্থলে পবিত্র সমাধি পর্যন্ত মেয়েরা আর যেতে পারবেন না। ২০০ মিটার দূরে আটকে দেওয়া হবে তাদের। বম্বে হাইকোর্ট ২০১৬-র ২৬ আগস্ট মহিলাদের পূর্ণ প্রবেশাধিকার দেওয়ার পক্ষে রায় দেয়। সেই রায় কার্যকর হল এদিন।

● **হার্ট অফ এশিয়া সম্মেলন :**

যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানের পুনর্গঠন এবং সেখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফেরানোর লক্ষ্যে ২০১১ সালের ২ নভেম্বর 'হার্ট অফ এশিয়া—ইস্তানবুল প্রসেস অন আফগানিস্তান'-এর জন্ম। সেই থেকে প্রতি বছরই বিভিন্ন সদস্য দেশে হার্ট অব এশিয়া সম্মেলন আয়োজিত হচ্ছে। গত ৩-৪ ডিসেম্বর অমৃতসরে মন্ত্রী-পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতে এই প্রথমবার। আফগানিস্তান এই সংগঠনের স্থায়ী প্রধান। যেহেতু সম্মেলন এবার ভারতে, সেহেতু ভারতের বিদেশমন্ত্রী এবারের সম্মেলনে সহকারী প্রধান। বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ অসুস্থ থাকায় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি ভারতের তরফে পৌরোহিত্য করেন। আফগান প্রেসিডেন্ট আশরফ ঘানি এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একসঙ্গে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জোট বাঁধার বিষয়টি এবারে 'হার্ট অফ এশিয়া' সম্মেলনের মঞ্চ দখল করে রাখে। পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির নামও চিহ্নিত করা হয় অমৃতসর-ঘোষণাপত্রে। লস্কর-ই-তইবা, হাক্কানি নেটওয়ার্ক, জইশ-ই-মহম্মদের মতো সংগঠনের নাম করে বলা হয়েছে, অবিলম্বে এই সমস্ত জঙ্গি সংগঠনকে নির্মূল করতে আঞ্চলিক ঐকমত্য তৈরি করতে হবে। বন্ধ করতে হবে জঙ্গিদের আর্থিক জোগান-সহ অন্যান্য সহায়তাও। উল্লেখ্য, পাকিস্তানও এই সম্মেলনের অন্যতম শরিক। অন্যান্য সদস্য আজারবাইজান, চিন, ইরান, কাজাখস্তান, কির্ঘিজস্তান, রাশিয়া, সৌদি আরব, তাজিকিস্তান, তুরস্ক, তুর্কমেনিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ান, রাষ্ট্রপুঞ্জের মতো ১৭-টি দেশ ও ১২-টি সংগঠন সমর্থনকারী হিসেবে এর সঙ্গে যুক্ত।

● **অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব পেশ :**

গত ৮ ডিসেম্বর অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি সংসদে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের যে প্রস্তাব পেশ করেছেন, তাতে সবচেয়ে বেশি অর্থ ধার্য হচ্ছে গ্রামীণ ও কৃষি ক্ষেত্রে। একশো দিনের কাজে বাড়তি ৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। যার ফলে চলতি আর্থিক বছরে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে মোট বরাদ্দ বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ৪৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। গ্রামের মানুষের রোজগার সুনিশ্চিত করার এই প্রকল্পে অতীতে এত অর্থ কোনও দিন বরাদ্দ হয়নি। কৃষক কল্যাণ, ফসল বিমা যোজনার মতো কৃষি সংক্রান্ত ক্ষেত্রে বাড়তি আরও ৩০৯৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন জেটলি। গ্রাম ও প্রত্যন্ত এলাকায় টেলিফোন ও ইন্টারনেট পরিষেবা বাড়াতে ২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। বিদেশ থেকে ডাল আমদানি ও দেশের কৃষকদের থেকে ডাল কেনার জন্য ১৯৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করছেন জেটলি।

● **শিক্ষাক্ষেত্রে 'বিত্তীয় সাক্ষরতা অভিযান' :**

গত ১২ ডিসেম্বর থেকে টানা এক মাস দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনা নগদে আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে সচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। কেন্দ্রীয় সরকারের 'বিত্তীয় সাক্ষরতা অভিযান' সূচনার আগে, ৮ ডিসেম্বর মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকরের সঙ্গে ভিডিও-সম্মেলনে দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং শিক্ষাসচিবদের যোগ দিতে বলা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনা নগদে আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে সচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণের ব্যাপারে ইউজিসি-র নির্দেশে বলা হয়েছে, এই কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য প্রতিটি ক্যাম্পাসকে সম্পূর্ণ নগদহীন করে তোলা। ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে যাবতীয় লেনদেনই নগদহীন করার পিছনে উপাচার্যদের যে বড়ো ভূমিকা রয়েছে, সেটাও মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে ইউজিসি-র ওই নির্দেশে। বলা হয়েছে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানেরা তাদের পড়ুয়াদের নগদহীন আর্থিক লেনদেনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সচেতন করবেন। পরে তারা এই বিষয়ে বৃহত্তর প্রচার কাজে যোগ দেবেন। বিষয়গুলি ছাত্রাছাত্রীদের বোঝানোর জন্য এই বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও কাজে লাগানোর পরামর্শ দিয়েছে ইউজিসি।

● **হিন্দুদের বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহে ফারাক ৯০ দিনের, জানাল কোর্ট :**

বিচ্ছেদের ৯০ দিন পরে হিন্দু পুরুষ বা মহিলা ফের বিয়ে করতে পারবেন বলে জানাল বম্বে হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চ। যদি না ওই বিচ্ছেদের নির্দেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে কোনও আবেদন হয়। হিন্দু বিবাহ আইন ও পরিবার আদালত আইনের নির্দেশে পার্থক্য থাকায় এ নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়। হিন্দু বিবাহ আইন অনুযায়ী, নিম্ন আদালতে বিচ্ছেদের নির্দেশের ৯০ দিনের মধ্যে উচ্চ আদালতে আবেদন করা যায়। কিন্তু পরিবার আদালত আইনে এক্ষেত্রে ৩০ দিন সময় দেওয়া হয়েছে। ২০০৭ সালের এপ্রিল মাসে বম্বে হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ হিন্দু বিবাহ আইন মেনে চলারই নির্দেশ দেয়। কিন্তু চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে থানের বাসিন্দা এক দম্পতির

মামলায় সেই নির্দেশ মানতে রাজি হয়নি হাইকোর্টের অন্য একটি ডিভিশন বেঞ্চ। ফলে মামলাটি চলে যায় ফুল বেঞ্চে। গত ৯ ডিসেম্বর ফুল বেঞ্চের তরফে জানানো হয়, দু'টি আইনের ধারার মধ্যে যখন বিরোধ থাকে, তখন সামঞ্জস্য বজায় রেখে পথ বেছে নিতে হয়। ভারতে বহু মানুষ অনেক কষ্ট ও খরচ করে মামলা চালান। তাই উচ্চ আদালতে আবেদন করার ক্ষেত্রে বেশি সময় দেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে হিন্দু বিবাহ আইন মেনে ৯০ দিন সময় দেওয়া হবে। উচ্চ আদালতে আবেদন না হলে ৯০ দিন পরে সংশ্লিষ্ট দু' পক্ষের যে কেউ ফের বিয়ে করতে পারবেন।

● **দুর্নীতিতে ধৃত প্রাক্তন বায়ুসেনা প্রধান :**

অগুস্তা-ওয়েস্টল্যান্ড কপ্টার দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন বায়ুসেনা প্রধান এস পি ত্যাগীকে গত ১০ ডিসেম্বর গ্রেপ্তার করে সিবিআই। সামরিক বাহিনীর ইতিহাসে এই প্রথম কোনও বাহিনীর শীর্ষ কর্তা এভাবে গ্রেপ্তার হলেন। প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর মতো ভিভিআইপি-দের যাতায়াতের জন্য ২০১০ সালে ভারতের সঙ্গে ইতালীয় সংস্থা ফিনমেকানিকা-র ব্রিটিশ শাখা সংস্থা অগুস্তা-ওয়েস্টল্যান্ডের মধ্যে ৩৬০০ কোটি টাকায় ১২-টি অত্যাধুনিক হেলিকপ্টার কেনার চুক্তি হয়। ২০১২ সালে প্রথম এই চুক্তিতে দুর্নীতির গন্ধ পায় ইতালি পুলিশ। ফোনে আড়ি পেতে তারা জানতে পারে, ওই কপ্টার বিক্রির চুক্তি নিশ্চিত করতে একটি সুইস সংস্থাকে ৫.১ কোটি ইউরো ঘুষ দিয়েছিল ফিনমেকানিকা। অর্থাৎ মোট চুক্তি মূল্যের প্রায় সাড়ে সাত শতাংশ (প্রায় ৩৬২ কোটি টাকা)। ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ ওঠে বায়ুসেনা প্রধান এস পি ত্যাগী ও তার তিন আত্মীয়ের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ঘুষ হিসেবে ভারতে আসা ১৩৮ কোটির মধ্যে ৭৬ কোটি টাকা গিয়েছে তাদের কাছে। দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় ২০১৪ সালে বাতিল হয়ে যায় ওই চুক্তি। তদন্তে নামে সিবিআই। আর বিদেশ থেকে ঘুষের টাকা কোন পথে ভারতে এসেছে তা দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকে। প্রায় দু' বছর আগে এই মামলায় সিবিআই গৌতম খৈতান নামে দিল্লির এক আইনজীবী ও বায়ুসেনা প্রধানের আত্মীয় সঞ্জীব ওরফে জুলি ত্যাগীকে গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ১২০বি, ৪২০ ধারা ও দুর্নীতি দমন আইনে গ্রেপ্তার করা হয়।

● **জাতীয় ও রাজ্য সড়কের ধারে মদের দোকানে নিষেধাজ্ঞা :**

জাতীয় এবং রাজ্য সড়কের ৫০০ মিটারের মধ্যে মদ বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করল সুপ্রিম কোর্ট। গত ১৫ ডিসেম্বর দেশের প্রধান বিচারপতি টি এস ঠাকুরের বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, আগামী পয়লা এপ্রিল থেকে এই নিয়ম কার্যকর করতেই হবে। নতুন দোকান বসানোর প্রশ্ন তো নেই-ই, পুনর্নবীকরণ করা যাবে না রাজ্য ও জাতীয় সড়কের ধারে থাকা কোনও মদের দোকানের লাইসেন্স। এমনকী মদের কোনও বিজ্ঞাপন জাতীয় সড়ক বা রাজ্য সড়কের উপর থাকলে, তাও অবিলম্বে সরিয়ে ফেলতে হবে। দেশের শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশিকা প্রত্যেকটি রাজ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং পুলিশ প্রধানদের নির্দেশ দেওয়া হয়, এই নির্দেশ যাতে সঠিকভাবে লাগু হয় সেদিকে বিশেষ নজর দিতে। শীর্ষ আদালতের রায়ে বলা হয়েছে, জাতীয় ও রাজ্য সড়ক থেকে মদের দোকান সরিয়ে ফেলতে হচ্ছে যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই। কারণ, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর জেরে ইদানীং জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর জেরে এ দেশে প্রতি বছর প্রায় ১ লক্ষ ৪২ হাজার মানুষ মারা যান। এর আগে বেশ কিছু রাজ্যের হাইকোর্টও একই ধরনের নির্দেশ জারি করেছিল। বলা হয়েছিল জাতীয় ও রাজ্য সড়কে নজরের সীমার মধ্যে কোনও মদের দোকান থাকা উচিত নয়। মদের দোকান কাছাকাছি না থাকলে, কোনও যাত্রী আর মদ কিনতে পারবেন না। সেই রায়গুলিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়।

● **দাড়ি রাখা যাবে না বায়ুসেনায় :**

ভারতীয় বিমানবাহিনীর অফিসারেরা ধর্মীয় কারণ দেখিয়ে দাড়ি রাখতে পারবেন না বলে জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি টি এস ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ গত ১৫ ডিসেম্বর জানায়, প্রত্যেক বাহিনীর নিজস্ব পোশাক ও আচরণবিধি রয়েছে। বিশেষত অনুপ্রবেশের আশঙ্কার নিরিখে বাহিনীর নিরাপত্তার স্বার্থে এই পরিচয় ধরে রাখা জরুরি। সেনাবাহিনীর নীতি কারও ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপের জন্য নয়। বরং অনুশাসন এবং ঐক্য বজায় রাখতেই তা তৈরি হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এই নিয়ে ২০০৩ সালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের জারি করা বিজ্ঞপ্তিই এখনও সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, ২০০২ সালের জানুয়ারির আগে বাহিনীতে যোগ দেওয়া যে মুসলিম আধিকারিক বা জওয়ানেরা আগেই দাড়ি এবং গোঁফ রেখেছিলেন, একমাত্র তারাই কাজে যোগ দেওয়ার পরেও তা রাখতে পারবেন।

● **সেনা, বায়ুসেনা, আইবি এবং র'-এর নতুন প্রধান :**

গত ১৮ ডিসেম্বর লেফটেন্যান্ট জেনারেল বিপিন রাওয়াতকে সেনাপ্রধান নিয়োগ করার কথা ঘোষণা করে কেন্দ্র। বায়ুসেনা প্রধানের পদ থেকে অরূপ রাহার অবসরের পর নতুন প্রধান হচ্ছেন উপ-প্রধান বীরেন্দ্র সিংহ ধানোয়া। প্রথম সারির এই যুদ্ধবিমান পাইলট কারগিল যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো বা আইবি-র নতুন অধিকর্তা হচ্ছে রাজীব জৈন। আইবি-তে ১৯৮৯ থেকে কাজ করছেন। এখন সংস্থার বিশেষ অধিকর্তা। একই সঙ্গে রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং (আরএডাব্লিউ) বা র'-তেও সংস্থার দ্বিতীয় শীর্ষ ব্যক্তি অনিল ধাসমানা পরবর্তী প্রধান হচ্ছেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল দলবীর সিং-সহ বিদায়ী প্রধানদের সকলেরই ৩১ ডিসেম্বর অবসর।

● **ভারত-ইন্দোনেশিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক :**

সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইডোডোর ভারত সফরের সময়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে বসে সে দেশের বাণিজ্যিক প্রতিনিধি দল। আলোচনা হয় প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের যৌথ উৎপাদন, প্রযুক্তি হস্তান্তর, কারিগরি সহযোগিতা ও সমুদ্রসীমা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে।

ভারত-ইন্দোনেশিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির কথা তুলে ধরা হয় বৈঠকে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস দমনে দুই দেশই একে অপরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছে। দুই দেশই আসিয়ান (অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশনস) শিখর সম্মেলনের মতো বহুপাক্ষিক সম্মেলনের পাশাপাশি বার্ষিক দ্বিপাক্ষিক সম্মেলন আয়োজনে সম্মত হয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তি, ওষুধ ও বিভিন্ন রকম পরিষেবার ক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়ার বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথাও আলোচনা হয়েছে। জ্বালানি ও খনিজ পদার্থ উত্তোলনে ভারত ইন্দোনেশিয়ায় বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। শিক্ষা ও বিনোদন ক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়া ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন বিনিময় কর্মসূচিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

প্রসঙ্গত, ভারত-ইন্দোনেশিয়া বাণিজ্যিক সম্পর্কের সূত্রপাত হয়েছিল জওহরলাল নেহেরু ও ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর সময় থেকেই। ইন্দোনেশিয়ায় ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে প্রেসিডেন্ট সুহার্তো ক্ষমতায় এলে, চিনের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার দূরত্ব তৈরি হয়। ভারত মহাসাগরে ইন্দোনেশিয়ার মৎস্য ব্যবসায়ীদের ও সমুদ্রপথে বাণিজ্য জাহাজকে চিনের হাত থেকে সুরক্ষা দিতে প্রেসিডেন্ট সুহার্তো ভারতের সঙ্গে প্রথম সমুদ্রসীমা নিরাপত্তা চুক্তির প্রস্তাব দেন। এই চুক্তি নেহরু জামানায় আংশিক সফল হয়েছিল। পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী ও সুহার্তো কন্যা মেঘাবতী সুকর্ণপুত্রীর আমলে ভারত-ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে 'মেরিটাইম সিকিউরিটি' চুক্তির গণ্ডি অনেক বেড়ে যায়।

পশ্চিমবঙ্গ

➢ পরীক্ষায় তৃতীয় লিঙ্গকে যে ব্রাত্য করে রাখা যায় না, একটি মামলার রায়ে সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছে রাজ্য প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল (স্যাট)। পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা পিএসসি-কে তাদের নির্দেশ, শুধু পুরুষ বা মহিলা নয়, সরকারি চাকরির ফর্মে তৃতীয় লিঙ্গের সংস্থানও রাখতে হবে।

● **নতুন জেলা আসানসোল, ঝাড়গ্রাম, কালিম্পং :**

আগামী পয়লা বৈশাখ পশ্চিমবঙ্গের তিনটি নতুন জেলা আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে বলে গত ২৮ নভেম্বর জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে নবান্ন ঘোষণা করে, রাজ্যে নতুন পাঁচটি জেলা তৈরি হবে। কলকাতা হাইকোর্টের সবুজ সঙ্কেত অনুযায়ী প্রথম পর্যায়ে হচ্ছে তিনটি জেলা—আসানসোল, ঝাড়গ্রাম ও কালিম্পং। দ্বিতীয় ধাপে আসবে বসিরহাট ও সুন্দরবন। প্রথম দফায় তিন নতুন জেলার সুবাদে পশ্চিমবঙ্গে জেলার সংখ্যা দাঁড়াবে ২২। সম্ভবত, আসানসোল জেলার নতুন নাম হবে বর্ধমান শিল্পাঞ্চল। এর দু'টি মহকুমা—দুর্গাপুর ও আসানসোল। আওতায় থাকবে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের অধীন এলাকাগুলো। বাকিটা রয়ে যাবে বর্ধমান জেলার মধ্যে। ঝাড়গ্রাম ও কালিম্পং জেলা কার্যত এখানকার দু'টি মহকুমা নিয়েই গড়ে উঠবে। ঝাড়গ্রাম অবশ্য ইতোমধ্যে 'পুলিশ জেলা' হিসেবে চিহ্নিত। সেটাই হবে ঝাড়গ্রাম জেলা।

● **এডিবি-র ঋণে কেন্দ্রের সায় :**

গত পয়লা ডিসেম্বর রাজ্যের তিন জেলায় পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বা এডিবি-র প্রায় ২৩০০ কোটি টাকা ঋণ প্রস্তাবে অনুমোদন দেয় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক। কেন্দ্র ঠিক করে, ২০১৯ সালের মধ্যে দূষণমুক্ত পানীয় জল দেশের সর্বত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। তাই একই সঙ্গে পানীয় জলে আর্সেনিক ও ফ্লোরাইডের সমস্যা মেটাতে রাজ্যকে আরও প্রায় ২৫০০ কোটি টাকা অনুদানের সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র। এডিবি-র ঋণের টাকায় পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং উত্তর চব্বিশ পরগণায় পানীয় জল প্রকল্পের রূপায়ণ করবে রাজ্য সরকার। মূল লক্ষ্য, নদী ও জলাশয়ের জল পরিশোধিত করে বাড়ি বাড়ি সরবরাহ করা। এতে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার কমবে এবং জেলার মানুষও আর্সেনিক বা ফ্লোরাইড মুক্ত জল খেতে পাবেন।

● **ই-রিকশায় কর বসাতে বিল :**

কেন্দ্রের অনুমোদনে এ রাজ্যে ই-রিকশা চলছে অনেক দিন ধরে। এবার সেই দূষণমুক্ত যানের উপরে এককালীন ৬৬০ টাকা কর বসাচ্ছে সরকার। গত ৭ ডিসেম্বর বিধানসভায় এ সংক্রান্ত দু'টি বিল আনা হয়—'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মোটর ভেহিক্লস ট্যাক্স (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০১৬' এবং 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাডিশনাল ট্যাক্স অ্যান্ড ওয়ান-টাইম ট্যাক্স অন মোটর ভেহিক্লস (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০১৬'। পয়লা জানুয়ারি থেকে ওই কর কার্যকর হওয়ার কথা।

নতুন বিলে ই-রিকশার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ব্যাটারিচালিত তিন চাকার ওই গাড়িটিকে রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় যোগাযোগের কাজে লাগানো হবে। চালক ছাড়া চার জনের বেশি যাত্রী নেওয়া যাবে না। ই-রিকশার মোটরের শক্তি কোনও অবস্থাতেই ২০০০ ওয়াটের বেশি হবে না এবং ঘণ্টায় ২৫ কিলোমিটারের বেশি গতিতে ওই গাড়ি চালানো যাবে না। বর্তমানে ওই তিন চাকার গাড়িকে অটোর বিকল্প ভাবা হলেও প্রস্তাবিত বিলে কিছু বিধিনিষেধ রয়েছে। যে-ধরনের ব্যাটারিচালিত গাড়িকে কেন্দ্র ই-রিকশার মর্যাদা দিয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রেই এই নিয়ম কার্যকর হবে।

● **পথ-নিরাপত্তা বাড়াতে নতুন আইন রাজ্যের :**

কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের হিসেব অনুযায়ী প্রতি বছর গোটা দেশে পথ-দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন গড়ে প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ। দুর্ঘটনা ঘটছে দৈনিক গড়ে ১২১৪-টি। কেন্দ্র ও আদালতের নির্দেশ মেনে পথ-নিরাপত্তা বাড়াতে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে অনেক রাজ্য। তৈরি হয়েছে পথ-নিরাপত্তা আইন। একই উদ্দেশ্যে এবার নতুন আইন করতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গও। তার নাম দেওয়া হয়েছে, 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল রোড সেফটি বিল, ২০১৬'।

নতুন আইনে 'রোড সেফটি অথরিটি' বা পথ-নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ নামে একটি সংস্থা গড়া হবে। তার মাথায় থাকবেন মুখ্যসচিব। ওই

সংস্থায় থাকবেন পুলিশ, পরিবহণ, শিক্ষা, তথ্য ও সংস্কৃতি, পূর্ত-সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিরা। একইভাবে জেলা স্তরে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকের নেতৃত্বে একটি করে 'ডিস্ট্রিক্ট রোড সেফটি কাউন্সিল' বা জেলা পথ-নিরাপত্তা পরিষদ গড়া হবে। কলকাতায় এই পরিষদের মাথায় থাকবেন পুলিশ কমিশনার নিজেই। জেলাভিত্তিক পথ-দুর্ঘটনার যাবতীয় তথ্য একত্র করে পাঠানো হবে সরকারের কাছে। তারা সমীক্ষা চালিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। নতুন আইনের আওতায় একটি তহবিল তৈরির সিদ্ধান্তও নিয়েছে সরকার। সড়কপথে আইন ভাঙলে যে জরিমানা নেওয়া হয়, তারই একটি অংশ গিয়ে জমা হবে ওই তহবিলে। প্রয়োজনে রাজ্য সরকারও ওই তহবিলে অর্থ বরাদ্দ করবে।

● **ফল-সবজি চাষে পরিধি বাড়ানোর কমিটি :**

রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে রুক্ষ মাটিতে ফল ও সবজি চাষের পরিধি বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে রাজ্য সরকার। ঠিক হয়েছে, প্রথম ধাপে অন্তত ১৫ হাজার কৃষক পরিবারকে এর আওতায় নিয়ে আসা হবে। আনা হবে জমিহীন কৃষকদেরও। পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য ইতিমধ্যেই রাজ্য স্তরে একটি কমিটি গড়া হয়েছে। বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর—এই চার জেলা এবং বর্ধমানের আসানসোল-দুর্গাপুর অঞ্চলের কিছু অংশে মাটি রুক্ষ, বৃষ্টিপাত কম। চাষবাসও কম হয়। জলের অভাবে বহু চাষ মার খায়। এই অঞ্চলগুলিতেই কম জলে উন্নত মানের বীজ, চারা ও সারের সাহায্যে সবজি ও ফল চাষ বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্যের উদ্যানপালন দপ্তর। এই প্রকল্পের জন্য রাজ্যের কৃষি, সেচ, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন ও অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরকেও জুড়ে নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে সাম্প্রতিক বৈঠকে সংশ্লিষ্ট কমিটি ঠিক করে জেলা সভাধিপতি ও জেলাশাসকদের মাথায় রেখে জেলা স্তরেও একটি করে কমিটি গড়া হবে।

● **রাজ্যের শিল্প সম্মেলন জানুয়ারিতে :**

গত ১৩ ডিসেম্বর সরকার চূড়ান্ত করে, বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট-২০১৭-এর আসর বসবে ২০-২১ জানুয়ারি। রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় উদ্বোধন করবেন। এবার ১১-টি ক্ষেত্রকে সম্মেলনের বিষয় ভাবনায় রাখা হয়েছে। বিমান পরিষেবা, স্বাস্থ্য, পর্যটন, পরিবহণ, বন্দর, খনি, ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ, কৃষি ও উদ্যানপালন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, শিক্ষা, তথ্য-প্রযুক্তি, আর্থিক পরিষেবা এমনকী নগরোন্নয়ন এবং নগরভিত্তিক ক্রীড়া পরিকাঠামোকেও আলোচনায় রাখা হচ্ছে। বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে সদ্য শুরু হওয়া সংস্থা (স্টার্ট-আপ) বা নতুন উদ্যোগপতিদের নিয়ে আলোচনার আসরে। সেখানে রাজ্যের সংস্থাগুলির পাশাপাশি অন্য রাজ্যের সংস্থা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসা করছে, এমন উদ্যোগপতিরাও থাকতে চলেছেন। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'ভাইব্রান্ট গুজরাত' শিল্প সম্মেলনের (৯-১৩ জানুয়ারি, আমেদাবাদ) উদ্বোধন করেন। কর্ণাটকের সম্মেলন হবে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি। ২০-২২ জানুয়ারি হরিয়ানায় শিল্প-সম্মেলন।

● **শৌচাগার নজরদারিতে ডাক ও বিদ্যুৎ কর্মীরাও :**

চিঠি বিলি করতে গিয়ে এবার বাড়িতে শৌচাগার আছে কি না, তার খোঁজও নেবেন মালদহের ডাক-কর্মীরা। এই জেলায় যারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিদ্যুতের বিল তৈরি করেন, তাদেরও এই কাজে লাগানো হচ্ছে। যদি তারা দেখেন, বাড়িতে শৌচাগার রয়েছে, তা হলে দেওয়া হবে নতুন বছরের একটি পকেট ক্যালেন্ডার। কিন্তু শৌচাগার না থাকলে, গৃহকর্তাকে তা বানানোর অঙ্গীকারপত্রে সই করানো হবে। মালদহে দ্বিতীয় পর্যায়ে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ৩৩-টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে নির্মল করতে এই উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন। গত ১১ ডিসেম্বর একটি কর্মশালারও আয়োজন করা হয়। প্রসঙ্গত, ২০১৬-র ১৫ আগস্টের মধ্যে জেলার গঙ্গা তীরবর্তী ২২-টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে নির্মল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

● **বিক্রয়কর তুলে দিয়ে মদে বাড়তি শুল্ক গোটা রাজ্যে :**

গত ১৭ ডিসেম্বর বিধানসভায় পেশ হয় কর সংশোধনী আইন। এর ফলে একদিকে যেমন জিএসটি চালুর আগে রাজস্ব আদায়ের নতুন কিছু সুযোগ তৈরি হবে, তেমনই জিএসটি চালু হয়ে গেলে বাড়তি ক্ষতিপূরণের টাকা মিলবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে। প্রসঙ্গত, এখন দেশি বা বিলিতি মদের উপর আবগারি শুল্ক ছাড়াও বিক্রয়কর নেওয়া হয়। আবগারি শুল্ক যেখানে মদের দামের উপর ৫১ শতাংশ, সেখানে দেশি মদের ক্ষেত্রে বিক্রয়কর নেওয়া হয় ১৫ শতাংশ এবং বিলিতি মদের ক্ষেত্রে ২৭ শতাংশ। কিন্তু জিএসটি চালু হয়ে গেলে আর বিক্রয়কর আদায়ের কোনও ব্যবস্থা থাকবে না। সেক্ষেত্রে প্রায় হাজার কোটি টাকা রাজস্ব হারানোর সম্ভাবনা। সেই কারণে অর্থ দপ্তর কর আইন সংশোধন করে অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক নামে একটি নতুন কর কাঠামো তৈরি করছে। সেই ব্যবস্থায় দেশি মদের উপর ২০ শতাংশ এবং বিলিতি মদের উপর ৫০ শতাংশ অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক চাপানোর প্রস্তাব রয়েছে। কর্ণাটকে এই ধরনের কর আদায় করা হয়। অন্য কয়েকটি রাজ্যেও মদের উপর বিক্রয়করের বদলে অতিরিক্ত শুল্ক চাপানো হয়। সেই ব্যবস্থাই এখানে চালু হতে যাচ্ছে।

জিএসটি চালু হলে আর বিক্রয়কর থাকবে না বলে মদ বিক্রি থেকে রাজ্যের আয় কমে যেতে পারে। বিক্রয়কর বাবদ যে টাকা আদায় হয় সেটা তখন নতুন আইন বলে অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক হিসাবে নেওয়া হবে। আবার বন্ধ হয়ে যাওয়া বিক্রয়করের টাকাটাও জিএসটি-র ক্ষতিপূরণ হিসেবে কেন্দ্রের কাছ থেকে চাওয়া হবে। শুধু মদের উপর শুল্ক নয়, বকেয়া কর আদায়ের ক্ষেত্রেও একটি ওয়েভার স্কিম আনা হচ্ছে। যে সমস্ত ভ্যাট ডিলারের কাছ থেকে বহু টাকা কর হিসেবে রাজ্যের প্রাপ্য এবং তা নিয়ে মামলা চলছে, সরকার তাদের জন্য বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করছে। ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত এই প্রকল্পের সুবিধা নেওয়া যাবে। কর সংশোধনীতে বলা হয়েছে, ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের ক্ষেত্রে যদি বিবাদ থাকে তবে বকেয়া করের ৩০ শতাংশ মিটিয়ে দিলে এবং অতিরিক্ত ব্যবসা ইত্যাদির উপর ধার্য করের ৬০ শতাংশ মিটিয়ে দিলেই সরকার সমস্ত রকম মামলা বন্ধ করে দেবে। এর ফলে অসংখ্য ভ্যাট ডিলারের সুবিধা হবে। কারণ, জিএসটি এলে তাদের সেই সম্পর্কিত করের আওতায় আসতে হবে।

● **আরও ৫ শহরে বাড়িতেই খোলা যাবে দোকান :**

বাড়িতেই দোকান খুলে আয়ের সুযোগ করে দিতে বিধানসভায় 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০১৬' পাস হল গত ১৭ ডিসেম্বর। বিলে বলা হয়েছে, বিধাননগর, দুর্গাপুর, আসানসোল, চন্দননগর, শিলিগুড়ি—পাঁচ পুরনিগম (কর্পোরেশন) এলাকায় বাড়িতেই শিল্পকলার স্কুল, বই-পত্রিকা-কার্ড-সংবাদপত্র, অফিসের প্রয়োজনীয় জিনিস, বুটিক, খেলনা, পোশাক, মোবাইল, মাছ-মাংসের দোকান কিংবা ডাক্তারের চেম্বার ইত্যাদি ৪১ রকম ব্যবসা খোলা যাবে। কোন এলাকায় কীসের দোকান খোলা যাবে, সেটি সংশ্লিষ্ট পুরসভাই ঠিক করবে। ওই বিলে আরও বলা হয়েছে, যারা জলাজমি সংরক্ষণ করবেন, তারা জমির করে ৯০ শতাংশ ছাড় পাবেন।

● **লাইসেন্স পাওয়া সহজ করে ক্ষুদ্র শিল্পে সাফল্য :**

বিনিয়োগ নিয়ে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রকের সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ১১ থেকে নেমে গিয়েছে ১৫-এ। বিনিয়োগের মঞ্চে বড়ো শিল্পের যখন এই হাল, তখন একটু অন্য পথে হেঁটে মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পে কিন্তু ভালো সাফল্য পেয়েছে এই রাজ্য। লগ্নি টানতে 'এক জানালা'-র পরিবর্তে সরকার চালু করেছে 'ফিজিক্যাল উইন্ডো' ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় প্রতিটি জেলায় জেলা শিল্প কেন্দ্রগুলির লাগোয়া খোলা হয়েছে একটি 'শিল্প সহায়তা কেন্দ্র'। এই সহায়তা কেন্দ্র থেকেই ক্ষুদ্র সংস্থাগুলি ব্যবসা করার লাইসেন্স-সহ যাবতীয় ছাড়পত্র পেয়ে যাচ্ছে। 'ফিজিক্যাল উইন্ডো' ব্যবস্থায় দপ্তরের কর্মীরা অন্যান্য দপ্তরের থেকে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ও ছাড়পত্র জোগাড় করে আনছেন। আবেদনকারীকে কোথাও যেতে হচ্ছে না। সংস্থাগুলি দ্রুত ছাড়পত্র পেয়ে যাচ্ছে বলে প্রকল্প রূপায়ণের সময়সীমাও আগের তুলনায় কমেছে। ছোট খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা, চাল কল, বেকারি, বেসন কল, গুঁড়ো মশলা তৈরির কারখানা, সরষের তেল কল, লাইম স্টোন পাউডার-সহ বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক তৈরির কারখানার সঙ্গে বেশ কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পেরও আবেদনপত্র জমা পড়েছে।

সরকারের দেওয়া পরিসংখ্যান বলছে, 'ফিজিক্যাল উইন্ডো' ব্যবস্থা চালু হওয়ায় গত অর্থবর্ষের (২০১৫-'১৬) প্রথম ছ' মাসে প্রায় ছয় হাজার সংস্থার হাতে নতুন লাইসেন্স ও বিভিন্ন ধরনের অনুমোদন তুলে দেওয়া হয়েছে। যা তার আগের বছরগুলির তুলনায় ২০-২৫ শতাংশ বেশি। সব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে অন্তত ৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে রাজ্যে।

● **তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পে উৎসাহ রাজ্যে পাঁচ পুর এলাকায় :**

রাজ্যে তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পকে উৎসাহ দিতে বিধাননগর-সহ ৫-টি কর্পোরেশন এলাকায় বাড়ি তৈরির আইন ও পুর-কর সংক্রান্ত নিয়ম শিথিল করছে রাজ্য সরকার। গত ১৭ ডিসেম্বর এই মর্মে বিধানসভায় বিল পাস হয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থার জন্য কোনও বাড়ি তৈরি করতে গেলে তার নক্শা অনুমোদন থেকে আরম্ভ করে সম্পত্তি—করে প্রায় ৫০ শতাংশ ছাড় দেবে পুরসভা। এছাড়া বাড়ির ফ্লোর-এরিয়ার অনুপাত (এফএআর)-এর ক্ষেত্রেও পুরসভা অতিরিক্ত ছাড় দেবে। রাজ্যের যে-পাঁচটি কর্পোরেশন এই সুযোগ পাবে, সেগুলি হল : বিধাননগর, চন্দননগর, আসানসোল, দুর্গাপুর ও শিলিগুড়ি।

বিলে হলা হয়েছে, রাজ্য সরকারের অনুমোদন নিয়ে কোনও কর্পোরেশনের মেয়র-ইন-কাউন্সিলই কোনও সংস্থার অফিস ও জমির জন্য নির্ধারিত পুর-কর ও সম্পত্তি-করের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দিতে পারবেন। শর্ত হিসাবে বলা হয়েছে, ওই বাড়ির ৮০ শতাংশ ফ্লোর-এরিয়া শুধুমাত্র তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পের কাজেই ব্যবহার করতে হবে। বাড়ি তৈরির পর প্রথম ১২ বছর এই সুযোগ পাওয়া যাবে। ছাড় পাওয়ার জন্য রাজ্যের তথ্য-প্রযুক্তি দপ্তর থেকেও অনুমতিপত্র নিতে হবে। তালিকায় রয়েছে তথ্য-প্রযুক্তি শিল্প, কল সেন্টার, মেডিক্যাল ট্রান্সক্রিপশন, লিগাল ট্রান্সক্রিপশন, কম্পিউটার অ্যানিমেশন, কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট অন্য কাজ, কর সংক্রান্ত হিসাব, ভৌগোলিক তথ্য ইত্যাদি।

অর্থনীতি

- নভেম্বর মাসে এক ধাক্কায় অনেকটা কমলো মূল্যবৃদ্ধির হার। খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার দাঁড়াল ৩.৬৩ শতাংশ। ২০১৪ সালের নভেম্বরের (৩.২৩ শতাংশ) পর থেকে এত নিচে নামেনি মূল্যবৃদ্ধি। অক্টোবরে তা ছিল ৪.২০ শতাংশ। গত ১৩ ডিসেম্বর প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুসারে, নভেম্বর মাসে সরাসরি কমেছে শাক-সবজির দর (–১০.২৯ শতাংশ)। অক্টোবরেও তা কমেছিল। তবে নভেম্বর মাসে কিছুটা হলেও বেড়েছে ফল, ডাল, মাছ-মাংস-ডিমের মতো খাদ্যপণ্যের দাম। কমলো সার্বিক মূল্যবৃদ্ধিও। তা হয়েছে ৩.১৫ শতাংশ। অক্টোবরে এই হার ছিল ৩.৩৯ শতাংশ।
- ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ (এনএসই)-এর প্রথম মহিলা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর তথা চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার (এমডি-সিইও) চিত্রা রামকৃষ্ণের ইস্তফার পর তার উত্তরসূরি খুঁজতে কমিটি গড়া হল। এতে রয়েছেন এক্সচেঞ্জটির ডিরেক্টর দীনেশ কওঁয়ার এবং টি ভি মোহনদাস পাই। কমিটির বাকি দুই সদস্য হলেন মাহিন্দ্রা গোষ্ঠীর কর্ণধার আনন্দ মাহিন্দ্রা ও রিজার্ভ ব্যাংকের প্রাক্তন ডেপুটি গভর্নর ঊষা থোরাট।
- ফ্রান্সের অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন সরকারি তহবিলের অপব্যবহার এবং এক ব্যবসায়ীকে বিপুল অঙ্কের ক্ষতিপূরণ পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলেন আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের (আইএমএফ) ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক্রিস্তিন লাগার্দ।

'লেস ক্যাশ ইকনমি' (কম নগদের অর্থনীতি)

● **কেন্দ্রের 'লাকি গ্রাহক যোজনা' ও 'ডিজি ধন ব্যাপারি যোজনা' :**

নীতি আয়োগের সিইও অমিতাভ কান্ত গত ১৫ ডিসেম্বর নতুন দু'টি 'পুরস্কার প্রকল্প'-এর কথা ঘোষণা করেন। সরকারের তরফে

দেশের মানুষকে 'বড়োদিনের উপহার' স্বরূপ ২৫ ডিসেম্বর থেকে ওই দু'টি প্রকল্প চালু হচ্ছে। ডিজিট্যাল পেমেন্ট বা অনলাইনে আর্থিক লেনদেনকে আরও উৎসাহ জোগাতে 'লাকি গ্রাহক যোজনা'— আমজনতা থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি সকলকেই এই প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হবে 'লাকি ড্র'-এর ভিত্তিতে; আর, ব্যবসার প্রয়োজনে অনলাইনে আর্থিক লেনদেনকে উৎসাহ দিতে মূলত ব্যবসায়ী, শিল্পপতিদের জন্য 'ডিজি ধন ব্যাপারি যোজনা'। এই প্রকল্পে ব্যবসায়ী, শিল্পপতিরা যদি রোজ ৫০ টাকা থেকে ৩০০০ টাকা পর্যন্ত অনলাইনে আর্থিক লেনদেন করেন, তা হলে 'লাকি ড্র'-এর ভিত্তিতে তারা রোজ পেয়ে যেতে পারেন নগদ ১০০০ টাকা পুরস্কার। আর সপ্তাহে পেয়ে যেতে পারেন ৫০ লক্ষ টাকা পুরস্কার।

● **নগদহীন লেনদেনে গতি আনতে করছাড় :**

ব্যবসার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অনলাইন বা ডিজিটাল ব্যবস্থায় এবং ব্যাংকের চেকের মাধ্যমে জিনিসপত্রের দাম নেওয়া হলে এবার থেকে করছাড় পাওয়া যাবে। তবে যে-সমস্ত ব্যবসার পরিমাণ বছরে ২ কোটি টাকা পর্যন্ত, তাদের ক্ষেত্রেই এই নতুন ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে। এই মর্মে ১৯৬১ সালের আয়কর আইন সংশোধন করার সিদ্ধান্তও নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০১৬-'১৭ আর্থিক বছর থেকেই তা কার্যকর হওয়ার কথা। কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, নতুন ব্যবস্থা চালু করার জন্য আয়কর আইনের ৪৪এডি ধারাটি সংশোধন করা হবে। আর তা করা হবে ২০১৭ সালে আর্থিক বিলের মাধ্যমেই। উল্লেখ্য, এখন আয়কর আইনের ৪৪এডি ধারা অনুযায়ী, যেসব ব্যবসায় লেনদেন ২ কোটি টাকা পর্যন্ত, আদপে তাদের নিট মুনাফা যাই দাঁড়াক না কেন, লাভ ৮ শতাংশ ধরে তার উপরে আয়কর হিসাব করা হয়। নগদহীন লেনদেনে জোর দিতে তাই নতুন ব্যবস্থায় বলা হয়েছে—পণ্য বিক্রির পরে তার দাম ব্যাংকের চেকে অথবা ডিজিটাল ব্যবস্থায় নেওয়া হলে সেই মুনাফা ৮ শতাংশের পরিবর্তে ৬ শতাংশ ধরা হবে। ফলে ছোট ব্যবসায়ীদের তখন ৬ শতাংশ মুনাফার উপর আয়কর মেটালেই চলবে, প্রকৃত ব্যবসার পরিমাণ যাই হোক না কেন। কোনও ক্ষেত্রে আবার দাম আংশিকভাবে ব্যাংকের চেকে, ক্রেডিট/ডেবিট কার্ডে বা অন্য কোনও ডিজিটাল ব্যবস্থায় নেওয়া হলে, শুধুমাত্র ওই অংশের উপর ৬ শতাংশ মুনাফা ধরা হবে।

● **আরও ১১-টি নতুন পদক্ষেপ :**

৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল করার এক মাসের মাথায় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি গত ৮ ডিসেম্বর কালো টাকা আর জাল টাকার রমরমা রোখার পাশাপাশি কম নগদের অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হওয়ার লক্ষ্যে আরও ১১-টি নতুন পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেন :

✶ দেশে রোজ প্রায় সাড়ে চার কোটি মানুষ পেট্রোল-ডিজেল কেনেন। কার্ড বা ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পেট্রোল-ডিজেল কেনা হলে এবার থেকে দামে ০.৭৫ শতাংশ ছাড় মিলবে।

✶ কম-বেশি ১০ হাজার মানুষের বাস যে সব গ্রামে, সেই সব এলাকায় কেন্দ্রীয় সরকার দু'টি করে পয়েন্ট অফ সেল তৈরি করবে এবং সেখানে কার্ড সোয়াইপ করার জন্য মেশিন বসাবে। এর মাধ্যমে গ্রামীণ ভারতের বাসিন্দাদের মধ্যে প্রায় ৭৫ কোটি মানুষ ডিজিটাল লেনদেনের সুযোগ পাবেন।

✶ যাদের কাছে কিষাণ কার্ড রয়েছে, নাবার্ড-এর মাধ্যমে তাদের রু-পে ডেবিট কার্ড দেওয়া হবে। প্রায় ৪ কোটি ৩২ লক্ষ কৃষককে এই সুবিধা দেওয়া হবে।

✶ লোকাল ট্রেনের মাসিক টিকিট বা সিজন টিকিট অনলাইনে কেনা হলে ০.৫ শতাংশ ছাড় মিলবে।

✶ অনলাইন রেল টিকিট কিনলে নিখরচায় ১০ লক্ষ টাকার দুর্ঘটনাজনিত বিমার সুবিধা মিলবে।

✶ রেল টিকিট অনলাইন কাটলে ক্যাটারিং, রিটায়ারিং রুম-সহ রেলের বিভিন্ন পরিষেবা ৫ শতাংশ কম খরচে পাওয়া যাবে।

✶ সর্বোচ্চ ২০০০ টাকা পর্যন্ত কেনাকাটা যদি ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে হয়, তা হলে পরিষেবা কর দিতে হবে না। এত দিন ১৫ শতাংশ হারে এই কর দিতে হ'ত।

✶ বিমা ক্ষেত্রে বড়োসড়ো ছাড়ের ঘোষণা করেছেন জেটলি। কোনও বিমা পলিসি যদি সংশ্লিষ্ট সংস্থার পোর্টাল ব্যবহার করে কেনা হয় এবং ডিজিটাল মাধ্যমে যদি প্রিমিয়াম জমা দেওয়া হয়, তা হলে সাধারণ বিমার প্রিমিয়ামে ১০ শতাংশ এবং জীবন বিমার প্রিমিয়ামে ৮ শতাংশ ছাড় মিলবে।

✶ সরকারি সংস্থাগুলি কোনও ডিজিটাল লেনদেনের উপর ট্রানজ্যাকশান ফি ধার্য করবে না।

✶ জাতীয় সড়কের টোল প্লাজায় ডিজিটাল মাধ্যমে টোল ট্যাক্স জমা দেওয়া হলে সরাসরি ১০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে।

✶ বিভিন্ন ছোটোখাটো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানও যাতে সোয়াইপ মেশিনের ব্যবস্থা রেখে খরিদ্দারকে কার্ডে লেনদেন করতে সাহায্য করতে পারেন, তার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি ন্যূনতম ভাড়ায় সোয়াইপ মেশিন দেবে।

● **সাধারণ মোবাইল ফোনে নগদহীন লেনদেন :**

সাধারণ মোবাইল ফোনেও নগদহীন লেনদেনের সুযোগ দিতে বছর দু'য়েক আগে বিশেষ ব্যাংকিং পরিষেবা চালু হয়। ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এনপিসিআই)-এর দাবি, ২০১৪ সালে জনধন প্রকল্পের সূচনার পরেই ওই 'আনস্ট্রাকচারড সাপ্লিমেন্টারি সার্ভিস ডেটা' (ইউএসএসডি)-ভিত্তিক ব্যাংকিং পরিষেবা চালু হয়েছিল। এখন দেশের ৫৬-টি ব্যাংকেই এটি চালু। ফোন কম দামি ও সাধারণ হোক বা স্মার্ট ফোন, সবেতেই *৯৯# এই বিশেষ 'ইউএসএসডি কোড' লিখে তার পর বিভিন্ন 'অপশন' বা সুবিধা পেতে পারেন গ্রাহক। এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক এই ব্যবস্থার খুঁটিনাটি।

✶ গ্রাহকের মোবাইল নম্বর অ্যাকাউন্টে নথিভুক্ত করা।

✶ মোবাইল ব্যাংকিং পরিষেবা নিতে ব্যাংকের কাছে আর্জি।

✶ ব্যাংক থেকে কিংবা ফোনেই 'এমএমআইডি' কোড চাওয়া।

✶ একইভাবে লেনদেনের জন্য 'এম-পিন' নেওয়া।

✶ যাকে টাকা পাঠাবেন, তারও এমএমআইডি থাকতে হবে। সেটি লিখে এম-পিন ব্যবহার করে টাকা পাঠাতে হবে।

✶ দু'জনের আলাদা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট থাকলেও লেনদেনে সমস্যা নেই।

✶ একলপ্তে, ৫,০০০ টাকার বেশি লেনদেন করা যাবে না।

● **পাম্পে মোবাইল ফোন ব্যবহারের নিয়ম শিথিল :**

নগদ ছাড়াও ব্যাংকের ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড দিয়ে বরাবরই পাম্পে তেলের টাকা মেটাতে পারেন ক্রেতা। কার্ডের পাশাপাশি মোবাইল অ্যাপ ব্যবহারের গুরুত্বও বাড়ছে। বিভিন্ন ব্যাংকের নিজস্ব মোবাইল অ্যাপ ছাড়াও কিছু বেসরকারি সংস্থার অ্যাপ বাজারে চালু রয়েছে, নোট বাতিলের পরে যাদের ব্যবহার ঊর্ধ্বমুখী। কিন্তু তেল দাহ্য পদার্থ বলে নিরাপত্তার প্রশ্নে ২০০২ সালে পাম্পে মোবাইল ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছিল কেন্দ্র। পাম্পের যে-মূল ট্যাঙ্কে (ট্যাঙ্ক ফার্ম) তেল রাখা হয়, সেখান থেকে বিভিন্ন গাড়িতে তা ভরা হয় ডিসপেন্সিং ইউনিট মারফত। সেগুলির কাছাকাছি মোবাইল ফোন ব্যবহার করলে বাতাসে মিশে থাকা তেলের বাষ্প থেকে আগুন ধরার আশঙ্কা থাকে। তাই সতর্কতা হিসাবে সার্বিকভাবেই মোবাইলের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। এখন সেই নিয়ম কিছুটা শিথিল করছে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক। বস্তুত, পাম্পের 'ডিসপেন্সিং ইউনিট' কিংবা 'ট্যাঙ্ক ফার্ম' থেকে কমপক্ষে ৬ মিটারের (প্রায় ১৯.৭ ফুট) মধ্যে কোনওভাবেই এই লেনদেন করা যাবে না। মোবাইল অ্যাপ দিয়ে লেনদেনের জন্য পাম্পে ঢোকা বা বেরোনোর মুখে আলাদা কিয়স্ক করার কথা বলছে তেল সংস্থাগুলি। আবার মোবাইল অ্যাপে 'কিউআর কোড' স্ক্যান করেও সরাসরি টাকা পাঠানো যায়। তেল সংস্থাগুলি জানাচ্ছে, নতুন নিয়মে কিউআর কোড-ও ওই দূরত্বের মধ্যে রাখা যাবে না।

● **ডিজিটাল লেনদেনের দীর্ঘমেয়াদি রোডম্যাপ তৈরির কমিটি :**

পাঁচশো-হাজারের নোট বাতিলের পর ডিজিটাল লেনদেনের পথ সহজ করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তৈরি করা কমিটির মাথায় থাকছেন প্রাক্তন ইনফোসিস কর্তা নন্দন নিলেকানি। এই প্রথম নয়, আগেও অভিন্ন পরিচয়পত্র তৈরির জন্য 'ইউনিক আইডেন্টিটি প্রোগ্রাম' বা আধার প্রকল্পের শীর্ষে ছিলেন তিনি। সারা দেশ জুড়ে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে 'লেস ক্যাশ' অর্থনীতি ব্যবস্থা চালু করার জন্য নিলেকানির নেতৃত্বে কাজ করবে ১৩ সদস্যের কমিটি। কমিটিতে রয়েছেন ৬ জন মুখ্যমন্ত্রী। অন্ধ্রের চন্দ্রবাবু নাইডু, ওড়িশার নবীন পট্টনায়ক, পদুচেরির ভি নারায়ণস্বামী, সিকিমের পবনকুমার চামলিং, মধ্যপ্রদেশের শিবরাজ সিংহ চৌহান আর মহারাষ্ট্রের দেবেন্দ্র ফড়নবীস। নীতি আয়োগের ভাইস-চেয়ারম্যান অরবিন্দ পানাগড়িয়া এবং সিইও অমিতাভ কান্তও রয়েছেন কমিটিতে।

● **প্রধানমন্ত্রী গরিব জনকল্যাণ প্রকল্প :**

গত ১৭ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী গরিব জনকল্যাণ প্রকল্প চালু হয়। এর মাধ্যমে কেন্দ্রের কাছে কালো টাকা ঘোষণার সময় মিলবে ৩১ মার্চ পর্যন্ত। তবে পুরনো নোটে কালো টাকা জমা দিতে হবে ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে। গোড়াতেই মেটাতে হবে কর ও জরিমানা। কিন্তু তা সাদা না কালো, তা জানানোর জন্য ১৭ ডিসেম্বর থেকে আগামী বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময় মিলবে। কর, জরিমানা, সারচার্জ মিলিয়ে প্রায় ৫০ শতাংশ গুনে টাকা সাদা করার সুযোগ মিলবে। কর-জরিমানার একাংশ যাবে গরিবদের কল্যাণে। কর ফাঁকির টাকা থাকলে এই প্রকল্পে যোগ দিয়ে ৫০ শতাংশ কর-জরিমানা মিটিয়ে দিয়ে গরিবদের কল্যাণে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে। কর-জরিমানার পর বাকি টাকার ২৫ শতাংশ বিনা সুদের প্রকল্পে ব্যাংকের কাছে চার বছরের জন্য গচ্ছিত রাখতে হবে। তার মানে, মোট ঘোষিত টাকার ২৫ শতাংশ সঙ্গে সঙ্গে সাদা করা যাবে। বাকি ২৫ শতাংশ চার বছর পর হাতে মিলবে। তবে এরপর ধরা পড়লে ৭৭.২৫ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশ কালো টাকাই বাজেয়াপ্ত হবে। সিবিআই-এর মামলা হবে। একইসঙ্গে কালো টাকা ধরতে সাধারণ মানুষকেও সামিল করেছে কেন্দ্র। কারও কাছে তার খবর থাকলে জানানোর জন্য দেওয়া হয়েছে ই-মেল **blackmoneyinfo@incometax.gov.in**।

● **সোনা-গয়না নিয়ে নিয়ম স্পষ্ট করল কেন্দ্র :**

গত পয়লা ডিসেম্বর বাড়িতে বা ব্যাংকের লকারে থাকা সোনা ও গয়না নিয়ে নিয়ম স্পষ্ট করল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ বা সিবিডিটি জানিয়েছে, গয়না ও সোনার উপর নতুন করে কর বসানোর কোনও প্রস্তাব আনেনি কেন্দ্র। সেই প্রসঙ্গেই সিবিডিটি খোলসা করে বলে যে সাধারণভাবে গয়না ও সোনা রাখার কোনও সীমা থাকবে না। তবে সেক্ষেত্রে কয়েকটি শর্ত বহাল থাকছে। যেমন, বৈধ উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্বপুরুষের কাছ থেকে পাওয়া গয়না/সোনায় কর বসছে না। ঘোষিত আয়ে ও 'যুক্তিসঙ্গত' পারিবারিক সঞ্চয়ের টাকায় কেনা গয়না/সোনার উপর বর্তমানে কর বসানোর কোনও নিয়ম নেই। সংশোধিত আয়কর আইনেও এ রকম প্রস্তাব নেই। একইভাবে কৃষিখাতে রোজগারের টাকায় কেনা সোনা ও গয়নায় লাগবে না কোনও কর। (উল্লেখ্য, ভারতে কৃষির আয়ের উপর কর নেই।) এক্ষেত্রে যে-নিয়ম খাটবে, তা হল :

✶ বিবাহিতা মহিলাদের ক্ষেত্রে ৫০০ গ্রাম, অবিবাহিতাদের ২৫০ গ্রাম, পুরুষদের ১০০ গ্রাম পর্যন্ত সোনা আটক করা হবে না। প্রাথমিক অনুসন্ধানে সংশ্লিষ্ট মালিকের আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য না-থাকার কথা ধরা পড়লেও ওই পরিমাণ সোনা বাজেয়াপ্ত করা হবে না।

✶ উল্লিখিত পরিমাণের চেয়ে বেশি সোনা/গয়না থাকলেও তদন্তকারী অফিসার তা আটক নাও করতে পারেন, যদি জানা যায় যে, পারিবারিক প্রথা বা ঐতিহ্য অনুযায়ী তা রাখা হয়েছে।

● **দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার ছুঁল ৭.৩ শতাংশ :**

ভারত ৭.৩ শতাংশ। চিন ৬.৭ শতাংশ। গত ৩০ নভেম্বর প্রকাশিত সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী জাতীয় আয় বৃদ্ধির এই তুল্যমূল্য বিচারে দ্রুততম আর্থিক বৃদ্ধির দেশের তকমা আপাতত ধরে রাখল ভারত। কিন্তু সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিক্স অফিস-এর ওই পরিসংখ্যানই জানাচ্ছে, স্থায়ী মূলধন তৈরি বা 'গ্রস ফিক্সড ক্যাপিটাল ফর্মেশন' কমেছে, যা লগ্নি কমারই ইঙ্গিত। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি বৃদ্ধির হার ছুঁয়েছে ৭.৩ শতাংশ, যার জন্য সাধারণভাবে ৩.৩ শতাংশ হারে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিকেই কৃতিত্ব দিয়েছে সরকারি পরিসংখ্যান। আগের ত্রৈমাসিক, এপ্রিল থেকে জুনে জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৭.১ শতাংশ। গত বছর একই সময়ে অবশ্য এই হার ছিল ৭.৬ শতাংশ। পাশাপাশি, এপ্রিল থেকে অক্টোবরের মধ্যে রাজকোষ ঘাটতি বাজেটের লক্ষ্যমাত্রার ৭৯.৩ শতাংশ ছুঁয়ে ফেলেছে বলেও পরিসংখ্যানে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। টাকার অঙ্কে তা ৪.২৪ লক্ষ কোটি। ২০১৭-র মার্চ পর্যন্ত ধরা লক্ষ্যমাত্রার নিরিখে এই হিসেব দাখিল করা হয়েছে। গত বছর এই একই সময়ে রাজকোষ ঘাটতি ছিল ওই লক্ষ্যের ৭৪ শতাংশ। ওই দিন প্রকাশিত জিডিপি বৃদ্ধির পরিসংখ্যান অনুসারে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উৎপাদন বেড়েছে ৩.৩ শতাংশ, খনন ক্ষেত্রে তা বেড়েছে ১.৫ শতাংশ; বিদ্যুৎ, গ্যাস, জল সরবরাহ ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদন বেড়েছে ৩.৫ শতাংশ, নির্মাণ শিল্পে ৩.৫ শতাংশ। আগের বছরে বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ২ শতাংশ, ৫ শতাংশ, ৭.৫ শতাংশ ও ০.৮ শতাংশ। কল-কারখানার উৎপাদন বেড়েছে ঢিমেতালে। গত বছরের ৯.২ শতাংশ থেকে তা কমে হয়েছে ৭.১ শতাংশ। স্থায়ী মূলধন তৈরির পরিসংখ্যান অনুযায়ী চলতি বাজার দরের ভিত্তিতে তা জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে সরাসরি কমেছে ৩.২ শতাংশ, যেখানে গত বছর একই সময়ে তা বেড়েছিল ৭.৫ শতাংশ। আর, মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব এড়াতে ২০১১-'১২ সালের দরকে ভিত্তি করে হিসেবে ধরলে তা কমেছে ৫.৬ শতাংশ, যেখানে গত বছরের বৃদ্ধির হার ৯.৭ শতাংশ।

● **পরিকাঠামো বাড়ল ৬.৬ শতাংশ :**

অক্টোবরে উৎপাদন বাড়ল ৬.৬ শতাংশ। গত ছ' মাসে তা এত বেশি হারে বাড়েনি। সরকারি পরিসংখ্যানে গত ৩০ নভেম্বর এ কথা জানিয়ে বলা হয়, ইস্পাত ও তেল শোধনাগারের উৎপাদন বাড়ার কারণেই পরিকাঠামো শিল্প এতটা এগিয়েছে। প্রসঙ্গত, সেপ্টেম্বরে এই হার ছিল ৫ শতাংশ, গত ২০১৫ সালের অক্টোবরে তা ছিল অনেকটাই কম, ৩.৮ শতাংশ। আটটি পরিকাঠামো শিল্পের এই তালিকায় রয়েছে কয়লা, অশোধিত তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, সার, ইস্পাত, সিমেন্ট, বিদ্যুৎ ও শোধনাগারের পণ্য। সার্বিকভাবে শিল্পোন্নয়নের হার হিসেব করার ক্ষেত্রে পরিকাঠামোর গুরুত্ব ৩৮ শতাংশ। এপ্রিল থেকে অক্টোবরের হিসেব ধরলে পরিকাঠামো শিল্পে উৎপাদন বেড়েছে ৪.৯ শতাংশ হারে। গত বছর এই একই সময়ে তা ছিল ২.৮ শতাংশ।

পরিসংখ্যান অনুসারে, অক্টোবরে ইস্পাত উৎপাদন এক লাফে বেড়েছে ১৬.৯ শতাংশ। এক বছর আগে তা সরাসরি কমেছিল ৫.৫ শতাংশ। তেল শোধনাগারের উৎপাদনও বেড়েছে ১৫.১ শতাংশ। এ ক্ষেত্রেও গত অক্টোবরে উৎপাদন বাড়েনি। তা সঙ্কুচিত হয়েছিল ৪.৪ শতাংশ। মূলত এই দুই শিল্পের উপর ভর করেই উজ্জ্বল হয়েছে অক্টোবরে পরিকাঠামো ক্ষেত্রের ছবি। পাশাপাশি, সারের উৎপাদন বেড়েছে ০.৮ শতাংশ, বিদ্যুৎ ২.৮ শতাংশ। গত বছর তা ছিল যথাক্রমে ১৬.৮ শতাংশ ও ১৩.৮ শতাংশ। কয়লা উৎপাদন অবশ্য অক্টোবরে সরাসরি কমেছে ১.৬ শতাংশ।

● **বেসরকারি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ নিয়ে সমীক্ষা :**

নতুন জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির অগ্রগতি বেশ হতাশাজনক বলেই কেন্দ্রের কাছে পাঠানো সমীক্ষায় ধরা পড়ে। কেন্দ্রীয় সংস্থা সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটি (সিইএ) সরকারের কাছে ওই সমীক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট পাঠায়। সৌর ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে বাড়তি জোর দিচ্ছে কেন্দ্র। সৌরবিদ্যুতের ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থাগুলির লগ্নির হার বাড়ার পাশাপাশি দ্রুত উৎপাদনও শুরু হচ্ছে। বেসরকারি সংস্থাগুলির উদ্যোগে সারা দেশে মোট ৩৮ হাজার মেগাওয়াটের মতো জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে প্রাথমিক অনুমোদন দেওয়া হয়। তার মধ্যে এখনও পর্যন্ত মাত্র ৩,২৬০ মেগাওয়াটের মতো প্রকল্পে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করা গিয়েছে, যা আদৌ আশাপ্রদ নয়।

সারা দেশে মোট ১২০-টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের মধ্যে মাত্র ২০-টি থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে ৩ মেগাওয়াটের মতো ছোটো জলবিদ্যুৎ প্রকল্পও রয়েছে। সিইএ-র তথ্য অনুযায়ী, ১৯-টি বেসরকারি সংস্থার প্রস্তাবিত মোট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সাড়ে চার হাজার মেগাওয়াট। সেগুলির নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ১৫ হাজার মেগাওয়াটের মতো উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ২২-টি নতুন প্রকল্পের বিস্তারিত প্রতিবেদন বা 'ডিটেল্ড প্রজেক্ট রিপোর্ট'-এ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলেও সিইএ সূত্রে খবর। আরও বেশ কিছু নতুন প্রকল্পের প্রস্তাব ফের সিইএ-র কাছে পেশ করতে বলা হয়েছে।

● **তেল উৎপাদন কমাচ্ছে ওপেক :**

অবশেষে তেল উৎপাদন ছাঁটার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল ওপেক। গত আট বছরের মধ্যে এই প্রথম। বিশ্ব বাজারে তেলের দামের টানা পতন রুখতে গত ৩০ নভেম্বর ভিয়েনায় উৎপাদন কমানোর এই সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিয়েছে ১৪-টি তেল রপ্তানি দেশগুলির এই সংগঠন। দীর্ঘ দিনের জল্পনা ও আশঙ্কায় ইতি টেনে সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে নীতিগতভাবে ওপেক রাজি হয়েছিল গত সেপ্টেম্বরে আলজিরিয়ায় আয়োজিত বৈঠকেই। এই খবরে এক ধাক্কায় বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের দাম বেড়ে গিয়েছে ১০ শতাংশ। চাহিদার তুলনায় বহু গুণ বেশি জোগানের জেরে বিশ্ব বাজারে তেলের দাম হুড়মুড়িয়ে পড়ছে বহু দিন ধরেই। ওপেকের তরফে জানানো হয়, দিনে ১২ লক্ষ ব্যারেল কমিয়ে তেল উৎপাদনের সর্বোচ্চ সীমা ৩.২৫ কোটি করতে রাজি হয়েছে তাদের সদস্য দেশগুলি। এমনকী উৎপাদন ছাঁটার কর্মকাণ্ডে এবার সামিল করা গিয়েছে রাশিয়ার মতো

ওপেক-বহির্ভূত দেশকেও। চুক্তি অনুযায়ী, রাশিয়া দিনে উৎপাদন ৩ লক্ষ ব্যারেল কমাবে বলে কথা দিয়েছে। ওপেক জানিয়েছে, ২০১৭-র জানুয়ারি থেকেই শুরু হবে গোটা প্রক্রিয়া।

● **সাহারাকে ৬০০ কোটি জমার নির্দেশ :**

সাহারা-সেবি মামলায় সুব্রত রায়কে ৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আরও ৬০০ কোটি টাকা মেটাতে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। ২৮ নভেম্বর শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ বলে, সাহারা-কর্তাকে লগ্নিকারীদের টাকা ফেরাতে তৈরি সেবি-সাহারা অ্যাকাউন্টে নির্দিষ্ট সময়ে টাকা জমা দিতেই হবে। পাশাপাশি, বাজার থেকে 'বেআইনিভাবে' তোলা টাকা লগ্নিকারীদের ফেরত দিতে সাহারা যদি তাদের সম্পত্তি বেচে টাকা তুলতে না পারে, তবে সুপ্রিম কোর্ট এজন্য 'রিসিভার' নিয়োগ করবে বলেও জানিয়েছে বেঞ্চ।

● **স্টার্ট-আপে পুঁজি জোগাতে নিয়ম সরল :**

নতুন উদ্যোগের (স্টার্ট-আপ) হাতে বাড়তি তহবিল জোগানোর নিয়ম সরল করল শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি। ওই সব সংস্থার শেয়ার বা বন্ডে পুঁজি ঢালে যেসব এঞ্জেল ফান্ড, তারা পাঁচ বছরের পুরনো স্টার্ট-আপেও লগ্নি করতে পারবে। এতদিন তা ছিল ৩ বছর। এঞ্জেল ফান্ডের লগ্নির ন্যূনতম মেয়াদও তিন থেকে কমিয়ে এক বছর করা হয়েছে। সর্বনিম্ন লগ্নিও ৫০ লক্ষ থেকে কমে হয়েছে ২৫ লক্ষ টাকা। এবার একসঙ্গে ৪৯-টির বদলে ২০০-টি এঞ্জেল ফান্ডের পুঁজি কাজে লাগাতে পারবে তারা। পাশাপাশি, ঋণপত্রের বাজারকে চাঙ্গা করতে বাজারে নথিভুক্ত নয়, এমন কর্পোরেট বন্ডে বিদেশি লগ্নির অনুমতিও দিয়েছে তারা। বিদেশি লগ্নিকারী সংস্থাগুলি (এফপিআই) এতে ৩৫ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত ঢালতে পারবে।

ছোটো লগ্নিকারীদের স্বার্থ রক্ষায়ও উদ্যোগী হয়েছে সেবি। বিভিন্ন নথিভুক্ত সংস্থা বা তাদের শীর্ষ কর্তারা এখন থেকে বেসরকারি ইক্যুইটি ফান্ডের সঙ্গে মুনাফা ভাগাভাগি সংক্রান্ত চুক্তি আলাদাভাবে করতে পারবে না। যদি করতেই হয়, তবে সংস্থার পর্ষদ ও অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারদের সায় লাগবে। গোপনে এই চুক্তি করার ঝোঁক ঠেকাতেই এই সিদ্ধান্ত। উল্লেখ্য, প্রাইভেট ইক্যুইটি ফান্ড বিভিন্ন নথিভুক্ত সংস্থার শেয়ারে লগ্নি করে থাকে।

● **আরবিআই সুদ একই রাখল :**

গত ৭ ডিসেম্বর সুদের হার কমানোর পথে হাঁটল না রিজার্ভ ব্যাংক। গভর্নর উর্জিত প্যাটেলের নেতৃত্বে ছ' সদস্যের ঋণনীতি কমিটি একমত হয়েই অপরিবর্তিত রাখে সুদের হার। এর জেরে রেপো রেট (যে-হারে বাণিজ্যিক ব্যাংক আরবিআই-এর কাছ থেকে ঋণ নেয়) ৬.২৫ শতাংশে ও সিআরআর বা নগদ জমার অনুপাত (আমানতের যে-অংশ আরবিআই-এর কাছে গচ্ছিত রাখতে হয় ব্যাংককে) ৪ শতাংশে অপরিবর্তিত থাকছে। বৃদ্ধির পূর্বাভাস ৭.৬ শতাংশ থেকে কমে ৭.১ শতাংশ করা হয়। তবে মূল্যবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৫ শতাংশেই বজায় থাকল। বিদেশি মুদ্রার সম্পদ ২ ডিসেম্বরের হিসেবে বেড়ে ৩৬,৪০০ কোটি ডলার হয়েছে। পরবর্তী ঋণনীতি ৮ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করা হবে। নোট বাতিলের জেরে ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১১ নভেম্বরের মধ্যে জমা পড়া বাড়তি আমানতের ১০০ শতাংশই সিআরআর খাতে জমা দিতে বলেছিল আরবিআই। এদিন ওই নির্দেশ তুলে নিল তারা। শীর্ষ ব্যাংক জানিয়েছে, ১০ ডিসেম্বর থেকে তা উঠে যাচ্ছে।

● **বাংলাদেশের বিদ্যুৎ-বাজারে ডিভিসি :**

এবার বাংলাদেশকে বিদ্যুৎ বিক্রির প্রতিযোগিতায় নামল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডিভিসি)। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রকের কাছ থেকে সবুজ সঙ্কেত পেয়ে ইতোমধ্যেই সংস্থাটির এক দল কর্তা ঢাকায় গিয়ে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন পর্ষদের সঙ্গে বৈঠক করে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছেন। প্রয়োজনে আরও বেশি বিদ্যুৎ বিক্রিতেও তারা রাজি বলে বাংলাদেশ সরকারকে জানিয়েছেন। কারণ, শীঘ্রই ১২০০ মেগাওয়াট উদ্বৃত্ত বিদ্যুতের পাশাপাশি ডিভিসি-র বোকারোতে ৫০০ মেগাওয়াটের আরও একটি ইউনিট চালু হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে বাংলাদেশ যখন বিদ্যুৎ কেনার জন্য ভারতের বাজারে দরপত্র ছেড়েছিল, তখন ডিভিসি তাতে অংশগ্রহণ করেনি। এনটিপিসি এবং রাজ্যের বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম দরপত্র জমা দেয়।

● **বিদেশি পুনর্বিমা সংস্থার আবেদন :**

বিমা ব্যবসায় ঝুঁকির দায় কমাতে সংস্থাগুলি তাদের পলিসি বিক্রি করার পরে অন্য সংস্থার কাছে সেটির বিমা করায়। এটাই পুনর্বিমা। এই ব্যবস্থায় গ্রাহককে বিমার ক্ষতিপূরণ মেটাতে পুরো আর্থিক দায় মূল সংস্থাটির উপর থাকে না। বড়ো অংশ বহন করে পুনর্বিমা সংস্থা। এ রকম সাত বিদেশি পুনর্বিমা সংস্থা এবার ভারতে ব্যবসা করতে আইআরডিএ-র কাছে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেছে। এখন ভারতের বিমা সংস্থাগুলির সিংহভাগই জেনারেল ইনশিওরেন্স কোম্পানির (জিআইসি) কাছে পুনর্বিমা করায়। অনেক ক্ষেত্রে জিআইসি বিদেশি সংস্থার কাছে পুনর্বিমা করিয়ে থাকে। ফলে বিদেশি সংস্থার কাছে পুনর্বিমা করাতে ভারতীয় সংস্থাগুলিকে অনুমতি দেওয়াই আছে। কিন্তু এতে খরচ বেশি বলে সেই পথে হাঁটে না অনেকেই। এখানে সংস্থাগুলি দপ্তর খুলে ব্যবসা চালালে সেই খরচ কমবে।

● **প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদ কমলো :**

গত ১৯ ডিসেম্বর প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদ ৮.৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৮.৬৫ শতাংশ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল 'এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশান' (ইপিএফও)-র সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ বা সিবিটি। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী এই সিবিটি-র শীর্ষ পদাধিকারী। সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষেত্র মিলিয়ে প্রায় চার কোটি কর্মী প্রভিডেন্ট ফান্ডের আওতায় রয়েছেন। প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা থাকা অর্থের উপর গত আর্থিক বছরে তারা ৮.৮ শতাংশ হারে সুদ পান। ইপিএফও কর্তৃপক্ষ সুদ কমানোর সুপারিশ কেন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। উল্লেখ্য, এখন বছরে চারবার সুদের হার বিবেচিত হচ্ছে এবং প্রয়োজন মতো প্রতি ত্রৈমাসিকে হার বদলে যাচ্ছে স্বল্প সঞ্চয়ে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

● **উজ্জ্বলতম ও নিকটতম গ্রহাণু :**

2015-TC25 আদতে একটি গ্রহাণু বা অ্যাস্টারয়েড। এটি রয়েছে আমাদের পৃথিবী থেকে মাত্র ৮০ হাজার মাইল দূরে। তার মানে পৃথিবী থেকে চাঁদের যা দূরত্ব, তার তিন ভাগের এক ভাগ দূরত্বে রয়েছে এই সদ্য আবিষ্কৃত গ্রহাণুটি। এর আগে পৃথিবীর এত কাছে কোনও গ্রহাণুর হদিশ মেলেনি। এখনও পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যে ১৫ হাজার 'নিয়ার আর্থ অবজেক্ট'-এর হদিশ পাওয়া মিলেছে, তার মধ্যে এটি সবচেয়ে ছোট। ব্যাস মাত্র ৬ ফুট। কিন্তু তার চেয়েও যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হল এই গ্রহাণুর উজ্জ্বলতা। এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত গ্রহাণুদের মধ্যে এটি উজ্জ্বলতম। এটি আমাদের চাঁদের চেয়েও ৫ গুণ বেশি উজ্জ্বল। চাঁদ যেখানে মাত্র ১২ শতাংশ সূর্যালোককে প্রতিফলিত করতে পারে, সেখানে এই গ্রহাণুটি ৬০ শতাংশ সূর্যালোককে প্রতিফলিত করতে পারে। এর আবিষ্কর্তা আমেরিকার আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের লুনার অ্যান্ড প্ল্যানেটরি ল্যাবোরেটরির অ্যাসিস্টেন্ট বিষ্ণু রেড্ডি (জন্ম অন্ধ্রপ্রদেশে)। এই আবিষ্কারের খবরটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান জার্নাল 'দ্য অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল জার্নাল'-এর গত ৫ ডিসেম্বর সংখ্যায়। 2015-TC25 গ্রহাণু '44Nysa' থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা একটি অংশ। '44Nysa' গ্রহাণুটিও খুব বড়ো নয়। তার লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের মাপের। 2015-TC25 গ্রহাণুটির মধ্যে রয়েছে অফুরন্ত সিলিকেট যৌগ। যার কারণে সূর্যের আলোয় প্রতিফলিত হয়ে এত চিকচিক করে। যেমন, বালির কণার মধ্যে সিলিকেট থাকায় চিকচিক করে।

● **শনির বলয়ে ক্যাসিনি :**

ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির (ইএসএ বা 'এসা') বানানো 'ল্যান্ডার' মহাকাশযান 'হাইগেন্স'-এর হাত ধরে নাসার 'অরবিটার' মহাকাশযান 'ক্যাসিনি' শনির বহু দূরের কক্ষপথে ঢুকে পড়েছিল ১২ বছর আগে। পৃথিবী থেকে 'ক্যাসিনি-হাইগেন্স' রওনা দিয়েছিল সেই ১৯৯৭ সালে। তার পর পৃথিবীর অভিকর্ষ বল কাটিয়ে, শুক্র আর বৃহস্পতির পাশ কাটিয়ে সাত বছর ধরে একটানা মহাকাশে দৌড়ে শনির কক্ষপথে 'ক্যাসিনি-হাইগেন্স' পৌঁছেছিল ২০০৪ সালে। তার পর শনির একের পর এক চাঁদের কাছাকাছি গিয়েছে, তাদের কক্ষপথে পাক মেরেছে 'ক্যাসিনি-হাইগেন্স'। করেছে অনেক নতুন নতুন আবিষ্কার। হদিশ পেয়েছে শনির চাঁদ 'এনসেলাডাস'-এর অন্দরে গভীর সমুদ্রের। খোঁজ পেয়েছে শনির অন্য চাঁদ 'টাইটান'-এর অন্দরে লুকিয়ে থাকা তরল মিথেনে ভরা সমুদ্রেরও। ২০০৫ সালের ১৪ জানুয়ারি নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করে 'ল্যান্ডার' মহাকাশযান 'হাইগেন্স'-কে শনির চাঁদ 'টাইটান'-এ নামিয়ে দিয়েছিল 'ক্যাসিনি'। ২০০৪ সালের পয়লা জুলাই। 'ক্যাসিনি-হাইগেন্স'-এর আগে আরও তিনটি মহাকাশযান শনির পাশ কাটিয়ে ঘুরে বেরিয়ে গিয়েছিল।

গত ১ ডিসেম্বর শনির চাঁদ 'টাইটান' এক ধাক্কায় 'ক্যাসিনি'-কে ছুঁড়ে দেয় শনির বয়লগুলির দিকে। শনির নিরক্ষরেখার (ইক্যুয়েটর) দিকে। 'ক্যাসিনি'-র এই পর্বটাকে বলা হচ্ছে 'রিং-গ্রেজিং অরবিটস্'। এই প্রথমবার কোনও মহাকাশযান ঢুকে পড়ে শনির ২০-টি বলয়ের মধ্যে সবচেয়ে বাইরের বলয়টির অভিকর্ষ বলের চৌহদ্দিতে। এই পর্বটাকে বলা হচ্ছে, 'গ্রেজিং'। আগামী মার্চ-এপ্রিলে (২০১৭) শনির 'এফ' বলয়ে প্রায় ঢুকেই যাবে 'ক্যাসিনি'। তবে তখনও শনির 'এফ' বলয় থেকে 'ক্যাসিনি'-র দূরত্ব থাকবে প্রায় ৭ হাজার ৮০০ কিলোমিটার থেকে ৪ হাজার ৮৫০ কিলোমিটার। এই কক্ষপথগুলিতে 'ক্যাসিনি' থাকবে শনির মেঘমণ্ডলের ৫৬ হাজার মাইল বা ৯০ হাজার কিলোমিটার ওপরে। আর আগামী এপ্রিলে তা তলিয়ে যেতে শুরু করবে শনির অতলান্ত অন্দরে। আর সেই সময় তা থাকবে শনির মেঘমণ্ডল থেকে মাত্রই ১ হাজার ১২ মাইল বা ১ হাজার ৬২৮ কিলোমিটার ওপরে। তারপর শনির বুকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর।

প্রয়াণ

● **মঙ্গলমপল্লি বালমুরলীকৃষ্ণ :**

গত ২২ নভেম্বর চেন্নাইয়ে প্রয়াত হন প্রখ্যাত কর্ণাটকী ধ্রুপদী সঙ্গীতশিল্পী মঙ্গলমপল্লি বালমুরলীকৃষ্ণ (৮৬)। ১৯৩০-এ অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্ব গোদাবরী জেলার শঙ্করগুপ্তমে জন্ম। চার দশকেরও বেশি সময় ধরে সঙ্গীত বিশ্বকে সমৃদ্ধ করেন এই অসাধারণ প্রতিভা। শুধু ধ্রুপদী সঙ্গীতই নয়, একই সঙ্গে সমসাময়িক গানেও সমান স্বচ্ছন্দ ছিলেন তিনি। একাধিক বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারতেন। শুধু তামিলেই নয়, তেলুগু, সংস্কৃত, কন্নড়-সহ নানা ভাষার গানে সুর দেন। গান রবীন্দ্রসঙ্গীতও। যুগলবন্দী করেন ধ্রুপদী সঙ্গীতের একাধিক প্রখ্যাত শিল্পীদের সঙ্গে—পণ্ডিত ভীমসেন জোশী থেকে কিশোরী আমোনকার, উস্তাদ হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া থেকে পণ্ডিত যশরাজ, উস্তাদ জাকির হুসেন। গানের পাশাপাশি বেশ কিছু তামিল ও তেলুগু সিনেমায় অভিনয়ও করেন তিনি। ১৯৬৭ সালে 'ভক্ত প্রহ্লাদ' ছবি দিয়ে অভিনয় জগতে পা রাখেন। ১৯৭৬ সালে 'হংসগীত' ছবিতে এবং ১৯৮৭ সালে 'মাধবচার্য্য' সিনেমায় সুর দিয়ে পান জাতীয় পুরস্কার। দূরদর্শনের জনপ্রিয় 'মিলে সুর মেরা তুমহারা' গানে তামিল অংশটিতে গলা মেলাতে দেখা যায় বালমুরলীকে। পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ-সহ নানা সম্মান পান।

● **ফিদেল আলেহান্দ্রো কাস্ত্রো রুজ :**

কিউবা বিপ্লবের শীর্ষ নেতা এবং সে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা প্রেসিডেন্ট ফিদেল আলেহান্দ্রো কাস্ত্রো রুজ (৯০) গত ২৫ নভেম্বর মারা গেলেন। ১৯৫৯ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত কিউবার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৭৬ থেকে ২০০৮ দেশের প্রেসিডেন্ট পদে ছিলেন তিনি (পরে সেই দায়িত্ব নেন তারই ভাই রাউল কাস্ত্রো)। ২০১১ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারিও

ছিলেন। তার ৪৯ বছরের শাসনকালে ১০ জন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউসে শপথ নেন। বয়সজনিত অসুস্থতার জেরে সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে চলে যান কিন্তু অবসরের পরও কিউবা শাসন করছে তার প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টি অফ কিউবার প্রথম সেক্রেটারি ফিদেল কাস্ত্রো সংগঠনের শীর্ষে ছিলেন ১৯৬১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী দুনিয়ার কমিউনিস্ট নেতাদের অগ্রগণ্য ফিদেল কাস্ত্রোর ১৯২৬ সালের ১৩ আগস্ট কিউবার এক ব্যবসায়ী পরিবারে জন্ম হয়। ২১ বছর বয়সেই বামপন্থী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৫২ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের পর কিউবার প্রেসিডেন্ট হন মার্কিন ঘনিষ্ঠ ফুলহেনসিয়ো বাতিস্তা। ১৯৫৯ সালের ১ জানুয়ারি দীর্ঘ গেরিলা যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বাতিস্তা সরকারের পতন ঘটিয়ে কিউবায় ক্ষমতায় আসে কাস্ত্রোর দল। এই বিপ্লবে তার প্রধান সহযোগী ছিলেন আর এক কিংবদন্তী চে গেভারা। বিপ্লবের সংগ্রামে সঙ্গে ছিলেন তার ভাই এবং কিউবার বর্তমান প্রেসিডেন্ট রাউল কাস্ত্রোও। প্রসঙ্গত, কিউবার ক্ষমতা দখলের পরেই আমেরিকার সঙ্গে দ্রুত সম্পর্কের অবনতি এবং পরিণামে প্রায় ৬০ বছর ধরে মার্কিন অবরোধ। ১৯৭৩ সালে তিনি বলেন, আমেরিকা সেই দিন কিউবার সঙ্গে কথা বলবে, যে দিন তাদের প্রেসিডেন্ট হবেন একজন কৃষ্ণাঙ্গ। ঘটনাচক্রে, ওবামা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরেই কিউবার সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কের বরফ গলতে শুরু করে। ২০১৬-র মার্চে প্রথম কিউবা সফরে আসেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা।

● **জয়রাম জয়ললিতা :**

গত ৫ ডিসেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী তথা এআইএডিএমকে-র শীর্ষনেত্রী জয়রাম জয়ললিতা। প্রায় ৭৫ দিন ধরে চেন্নাইয়ের এক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে 'পুরুতচি থালাইভি' বা 'বিপ্লবী নেত্রী' নামে পরিচিত ছিলেন অভিনেত্রী থেকে রাজনৈতিক নেত্রী হয়ে ওঠা জয়ললিতা। অনুগামীরা ডাকতেন 'আম্মা' বলে। ১৯৪৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন মহীশূর (অধুনা কর্ণাটক) রাজ্যের মান্ড্যায় জন্ম। ১৯৬১ সালে মায়ের হাত ধরে অভিনয় জগতে পা রাখেন। এর তিন-চার বছরের মধ্যেই কন্নড় ছবি 'চিন্নাড়া গোম্বে'-তে নায়িকার ভূমিকায় দেখা যায় জয়ললিতাকে। পরবর্তীকালে ১৯৬৫ ও ১৯৬৬ সালে 'ভেন্নিরা আদাই' ও 'মানুশুলু মামাথালু'-তে যথাক্রমে তামিল ও তেলুগু ছবির পর্দায়ও তার অভিষেক হয়। ১৯৬১ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত মোট ১৪০-টি চলচ্চিত্রে তাকে দেখা যায়। এর মধ্যে অন্যতম ১৯৭২ সালে জাতীয় পুরস্কার জয়ী 'পত্তিকড় পত্তনাম' ছবিতে শিবাজি গণেশনের সঙ্গে অভিনয়। তামিল সিনেমার নক্ষত্র এবং পরবর্তীকালে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম জি রামচন্দ্রন (এমজিআর)-এর সঙ্গে জয়ললিতা ২৮-টি ছবিতে জুটি বাঁধেন। এমজিআর প্রতিষ্ঠিত দল, এআইএডিএমকে-তে যোগ দেন ১৯৮২ সালে এবং ১৯৮৪-তে রাজ্যসভার সাংসদ হন। ১৯৮৭ সালে এমজিআর-এর মৃত্যুর পর দল বিভক্ত হয়। সেই দু'টি অংশকে মিলিয়ে ১৯৮৯ সালে দলের নেত্রী হন এবং লোকসভা ভোটে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে তামিলনাড়ু ও পুদুচেরিতে ঐতিহাসিক জয় লাভ করেন জয়ললিতা। ১৯৯১ সালে রাজ্যের কনিষ্ঠতম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন তিনি। সেবার ২৩৪-টির মধ্যে ২২৫-টি বিধানসভা আসন দখল করে তার দল। এর পর ২০০১ ও ২০১১ সালে নির্বাচনে জয়ী হয়ে আবার মুখ্যমন্ত্রী হন তিনি। তবে ২০১৪ সালে আয়-বহির্ভূত সম্পত্তি মামলার জেরে ইস্তফা দেন। কর্ণাটক হাইকোর্টের রায়ে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে ২০১৫ সালে আবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। ২০১৬ সালের মে মাসের নির্বাচনে ফের তার দল ক্ষমতা দখল করে। তামিলনাড়ুর ইতিহাসে এর আগে এমজিআর ছাড়া আর কোনও মুখ্যমন্ত্রীই পর পর দু'বার বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করেননি।

● **হেনরি জুডা হেইমলিচ :**

গত ১৭ ডিসেম্বর মারা গেলেন মার্কিন শল্যচিকিৎসক তথা গবেষক হেনরি হেইমলিচ। বয়স হয়েছিল ৯৬। নিঃশ্বাস বন্ধ হতে বসা রোগীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরার সঙ্গে সঙ্গে পেটে চাপ—প্রায় নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বহু রোগীর প্রাণ বাঁচানো এই প্রক্রিয়ার আবিষ্কারক। তার এই পদ্ধতি ১৯৭৪ সালে এমার্জেন্সি মেডিসিনে 'হেইমলিচ ম্যানুভার' নামে স্বীকৃতি পায়।

● **জাঁ জাঁ গাবোর :**

গত ১৮ ডিসেম্বর মারা গেলেন হলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় তারকা জাঁ জাঁ গাবোর। বয়স হয়েছিল ৯৯ বছর ১০ মাস। জন্মসূত্রে হাঙ্গেরীয় গাবোরের জন্ম ১৯১৭ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি। নাৎসিরা যখন বুদাপেস্ট দখল করছে, তখন মা ও দুই বোনের সঙ্গে হাঙ্গেরি থেকে পালিয়ে যান তিনি। হলিউডে পা রাখেন একটু বেশি বয়সেই। পঞ্চাশের দশক থেকে একের পর এক ছবির নায়িকা। যার মধ্যে অন্যতম মুল্যাঁ রুজ (১৯৫২), লিলি (১৯৫৩), দ্য গার্ল ইন দ্য ক্রেমলিন (১৯৫৭) এবং কুইন অফ আউটার স্পেস (১৯৫৮)।

খেলা

● **এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন ভারতের মেয়েরা :**

গত ৪ ডিসেম্বর ব্যাংককে ১৭ রানে পাকিস্তানকে (১০৪/৬) হারিয়ে মেয়েদের এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন ভারত (১২১/৫)। এই নিয়ে ছ'বারের এশিয়া কাপের ইতিহাসে ছ'বারই ট্রফি ভারতের। এশিয়া কাপে টানা ৩২ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ডও রয়েছে ভারতের মেয়েদের দখলে। সেই সঙ্গে পর পর দু'বার এশিয়া কাপ ফাইনালে পাকিস্তানকে হারানোর রেকর্ডও। ফাইনালে টস জিতে প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর। ওপেন করতে এসে অপরাজিত ৭৩ রানের ইনিংস (৬৫ বলে) খেলেন মিতালি রাজ। ২০ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ১২১ রানে শেষ হয় ভারতের ইনিংস। জবাবে পাকিস্তান করে ১০৪ রান। ভারতের হয়ে একতা বিস্ত জোড়া উইকেট নেন। ফাইনাল ম্যাচে সেরা হওয়ার পাশাপাশি পুরো টুর্নামেন্টে ৪ ইনিংসে ২২০ রান করে সিরিজের সেরাও মিতালি রাজ।

- দুবাইয়ে গত ১২ ডিসেম্বর পিভি সিন্ধুকে 'মোস্ট ইম্প্রুভড প্লেয়ার অফ দ্য ইয়ার' পুরস্কারে সম্মানিত করে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন সংস্থা (বিডব্লিউএফ)।
- গত নভেম্বর মাসে পোলিশ ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হন ঋতুপর্ণা দাশ। এর পর আবার ২৭ নভেম্বর হায়দরাবাদে ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সিরিজও জিতে নেন তিনি।
- কোরিয়া মাস্টার্স গ্রাঁ প্রি গোল্ডের সেমিফাইনালে কোরিয়ার সন ওয়ান হো-র কাছে হেরে যান পারুপল্লি কাশ্যপ।
- গত ২৭ নভেম্বর হংকং ওপেনের ফাইনালে হেরে গেলেন পিভি সিন্ধু ও সমীর ভর্মা। দ্বিতীয় সুপার সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে নেমে চাইনিজ তাইপের তাই জু ইংয়ের কাছে হেরে যান সিন্ধু। অন্যদিকে, সমীর ভর্মা হারেন কা লংয়ের কাছে।
- গত ৫ ডিসেম্বর বিজয়ওয়াড়ায় জাতীয় সাব জুনিয়র ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নের খেতাব জিতলেন বাংলার উৎসব পালিত। টুর্নামেন্টের ফাইনালে হারালেন পুদুচেরির এস কবিপ্রিয়াকে।
- মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত চার দেশের হকি টুর্নামেন্টে ব্রোঞ্জ জেতে ভারতের পুরুষ দল। গত ২৭ নভেম্বর মালয়েশিয়াকে ১-৪ গোলে হারিয়ে তৃতীয় হয় ভারত। অন্যদিকে, তিন ম্যাচের সিরিজে ভারতের মেয়েরা অস্ট্রেলিয়াকে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেই ১-০-এ হারিয়ে ইতিহাস গড়ল—হকিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এই প্রথম জিতল ভারতের মেয়েরা। তবে বাকি দু' ম্যাচে (২৫ ও ২৭ নভেম্বর) জিতে সিরিজ জয় করে অস্ট্রেলিয়া।
- ডেভিড ওয়ার্নারের সেঞ্চুরিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চ্যাপেল-হ্যাডলি ট্রফি ৩-০-তে জিতল অস্ট্রেলিয়া। শেষ ম্যাচে মেলবোর্নে প্রথমে ব্যাট করে ২৬৪-৮ তোলে অস্ট্রেলিয়া। ওয়ার্নার ২১৮ বলে ১৫৬ (১৩ × ৪, ৪ × ৬) করেন। নিউজিল্যান্ড ১৪৭ অল আউট হয়ে যায়। ম্যাচ ও ওয়ান ডে সিরিজ সেরা ওয়ার্নার।
- চোটের কারণে গত জুলাইয়ের ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ থেকেই মাঠের বাইরে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকার সফল অধিনায়ক এবি ডি'ভিলিয়ার্স টেস্ট দলের অধিনায়কত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেই দায়িত্ব তুলে দেওয়া হল ফাফ দু প্লেসির হাতে। তবে ওয়ান ডে দলের এখনও অধিনায়ক ডি'ভিলিয়ার্সই।

● **১৫ বছর পর জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ ভারতের দখলে :**

গত ৮ ডিসেম্বর জুনিয়র বিশ্বকাপ হকি শুরু হয় লখনউয়ে। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী দিনই ভারতের ম্যাচ কানাডার বিরুদ্ধে। 'ডি' গ্রুপে ভারতের বাকি দু'টি ম্যাচ ইংল্যান্ড (১০ ডিসেম্বর) ও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে (১২ ডিসেম্বর)। তিনটি ম্যাচই পর পর জেতে ভারত। নক-আউট শুরু হয় ১৪ তারিখ। ১৮ ডিসেম্বর ফাইনালে বেলজিয়ামকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হয় ভারত। ১৫ বছর পর জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ ভারতের দখলে। এর আগে জিতেছিল ২০০১ সালে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে মাত দিয়েই ফাইনালে পৌঁছায় ভারত। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের সিনিয়র বিশ্বকাপ হকি ভুবনেশ্বরে আয়োজিত হবে।

● **এশীয় গল্ফ ট্যুর জিতে নজির :**

ঘরোয়া ট্যুরে ১২৩-টি পিজিটিআই টাইটেল আগেই জেতেন ভারতীয় গল্ফার মুকেশ কুমার। এবার একান্ন বছর বয়সে প্যানাসনিক ওপেন গল্ফ জিতে এশীয় ট্যুরে নজির গড়লেন—এশীয় ট্যুরের সবচেয়ে বেশি বয়সী চ্যাম্পিয়ন। খারাপ আবহাওয়ায় টুর্নামেন্ট কাটছাঁট করে তিন রাউন্ডের হয়। শেষ রাউন্ডে দুই-আন্ডার ৭০ স্কোর মুকেশের। মোট ১০-আন্ডার ২০৬। যা তার প্রথম এশীয় ট্যুর খেতাব নিশ্চিত করে। পুরস্কারে জেতেন বাহাত্তর হাজার মার্কিন ডলার। গত ৪ ডিসেম্বর মুকেশের থেকে এক শটে পিছিয়ে থেকে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় হলেন জ্যোতি রণধাওয়া ও রশিদ খান।

● **পিজিএ ট্যুরে খেলার যোগ্যতা অদিতি অশোকের :**

গত ১৩ নভেম্বর গুরুগ্রামের কোর্সে ইউরোপীয় ট্যুরে খেতাব জয়ী প্রথম ভারতীয় মেয়ে হয়ে ইতিহাস গড়েন বছর আঠারোর অলিম্পিয়ান অদিতি অশোক। ঠিক তেরো দিন পরে, ২৭ নভেম্বর দোহা গল্ফ ক্লাবে জিতলেন নিজের দ্বিতীয় খেতাব ও পঁচাত্তর হাজার ইউরোর বিজয়ীর চেক। এবার মেয়েদের পিজিএ ট্যুরে খেলার যোগ্যতাও পেয়ে গেলেন। এর আগে মেয়ে গল্ফারদের মধ্যে সিমি মেহ্রা বাদে ভারতের আর কেউ যা করে দেখাতে পারেনি। এলপিজিএ-র যোগ্যতা অর্জনের লড়াইয়ে শেষ ধাপে নেমে চব্বিশতম হলেন অদিতি অশোক। অলিম্পিক্সে নামা ভারতের প্রথম মেয়ে গল্ফার হিসেবে গুরুগ্রামে ইন্ডিয়ান ওপেন জেতার পর এ দিন কাতার লেডিস ওপেন জিতে ইউরোপীয় ট্যুরে পর পর দু'টি খেতাব জেতার বিরল নজির গড়লেন। ইউরোপীয় ট্যুরের র‍্যাঙ্কিংয়ে অদিতি উঠে এলেন তিনে। ২০১৬-র জানুয়ারিতে পেশাদার হওয়া অদিতি আপাতত ইউরোপীয় ট্যুরের বর্ষসেরা নতুন মুখ পুরস্কারের দৌড়ে এক নম্বরে। চারটি টুর্নামেন্টে সেরা দশে শেষ করেছেন। জিতেছেন দু'টি খেতাব।

● **ভারত ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ :**

গত নভেম্বর মাস থেকে ভারত সফরে ইংল্যান্ডের ক্রিকেট দল। অ্যান্টনি ডি মেলো ট্রফির জন্য দু' দেশের মধ্যে খেলা হয় ৫-টি টেস্ট ম্যাচ। প্রথম ম্যাচটি ড্র হয়। এর পর বাকি চারটি ম্যাচ জিতে ভারত ট্রফি জিতে নেয়। সিরিজে বহু রেকর্ড ভাঙ্গা-গড়া হয়।

- **টানা ১৮-টা টেস্ট অপরাজিত থাকার রেকর্ড ভারতের। ক্যাপ্টেন কোহালি ছুঁলেন গাওস্করকে।**
- **চলতি বছরে ন'টা টেস্ট জিতল ভারত। ভেঙে গেল ২০১০-এ সর্বোচ্চ আট টেস্ট জয়ের নজির।**
- **বিপক্ষ প্রথম ইনিংসে ৪৭৭ করার পরেও ইনিংসে জিতল ভারত। যা কখনও হয়নি। এর আগে ৪৩২ তুলে ইনিংস হেরেছিল ইংল্যান্ডই। ২০০১-এ অ্যাসেজে।**

➢ **এক টেস্টে হাফ সেঞ্চুরি, ১০ উইকেট ও চারটে ক্যাচ নিয়ে রেকর্ড রবীন্দ্র জাডেজার। কপিল দেবও ৫০ রান ও ১০ উইকেট নেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চেন্নাইয়ে ১৯৮০-তে। তবে ক্যাচ নিয়েছিলেন একটি।**

এর পাশাপাশি, শেষ টেস্টে ভারতের প্রথম ইনিংসে পাঁচ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে কেরিয়ারের প্রথম টেস্ট সিরিজের তৃতীয় ম্যাচেই তিনশো রান করে ইতিহাস গড়লেন করুণ নায়ার—৩৮১ বল ক্রিজে কাটিয়ে অপরাজিত ৩০৩ রান (৩২ × ৪, ৪ × ৬)। এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামেই ২০০৮-এ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৩১৯ রানের ঝোড়ো ইনিংসে খেলেছিলেন সেহওয়াগ। সাড়ে আট বছর পর সেই একই স্টেডিয়ামে তিনশো করে সেহওয়াগকে ছুঁলেন নায়ার। এটাই আবার তার প্রথম সেঞ্চুরি। এমন কৃতিত্বও নজিরবিহীন।

● **সাব-জুনিয়র ও ক্যাডেট জাতীয় টেবল টেনিস :**

ডিসেম্বরের ১ থেকে ৬ তারিখ শিলিগুড়িতে আয়োজিত হয় সাব-জুনিয়র ও ক্যাডেট জাতীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা। সাব-জুনিয়র ছেলেদের ব্যক্তিগত বিভাগে পেট্রোলিয়াম স্পোর্টস প্রোমোশন বোর্ড (পিএসপিবি)-র এইচ জেহো সোনা জেতে ফাইনালে পিএসপিবি-রই অপর খেলোয়াড় চিন্ময়া সোমাইয়াকে হারিয়ে। মেয়েদের সোনা জেতে মহারাষ্ট্র-এ দলের দিয়া চিতালে। ফাইনালে দিয়া হারিয়ে দেয় দিল্লির বনশিখা ভার্গবকে। ওই বিভাগে ব্রোঞ্জ পেয়েছে মহারাষ্ট্র-বি দলের বিধি অমিত শাহ এবং মহারাষ্ট্র-এ দলের স্বস্তিকা ঘোষ। প্রসঙ্গত, শিলিগুড়িই দেশের মধ্যে একমাত্র জায়গা যেখানে ক্যাডেট থেকে সাব-জুনিয়র, সিনিয়র সমস্ত বিভাগের টেবল টেনিসের জাতীয় প্রতিযোগিতা হয়েছে।

সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের তরফে মেয়েদের সাব-জুনিয়র ডাবলসে নিকিতা সরকার-শতপর্ণী দে জুটির রুপো, সাব-জুনিয়রে মেয়েদের দলগত বিভাগে একটি ব্রোঞ্জ, সাব-জুনিয়র মেয়েদের দলগত বিভাগে একটি সোনা, ক্যাডেটে মেয়েদের দলগত বিভাগে একটি রুপো, সাব-জুনিয়র ছেলেদের ডাবলসে একটি রুপো, ছেলেদের সাব-জুনিয়র দলগত বিভাগে একটি ব্রোঞ্জ, মেয়েদের সাব-জুনিয়র ডাবলসে আরেকটি ব্রোঞ্জ এবং ক্যাডেটে ব্যক্তিগত বিভাগে পৃথকী চক্রবর্তী ব্রোঞ্জ পদক জেতে।

● **ডেভিস কাপ চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্তিনা :**

এই প্রথমবার ডেভিস কাপ জিতল আর্জেন্তিনা। গত ২৮ নভেম্বর বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ছয় নম্বর মারিন চিলিচের বিরুদ্ধে প্রথম দু'টো সেট হেরে গিয়েও অ্যাওয়ে ম্যাচে (ফাইনাল হয়েছে ক্রোয়েশিয়ার ইন্ডোর হার্ডকোর্টে) পরের তিনটে সেট দেল পোত্রো জেতেন। যার পরে চূড়ান্ত ম্যাচে সাঁইত্রিশ বছরের ইভো কার্লোভিচকে স্ট্রেট গেমে উড়িয়ে দেন বিশ্বের ৪১ নম্বর ফেদেরিকো দেলবোনিস। উল্লেখ্য, কার্লোভিচ সবচেয়ে বয়স্ক ডেভিস কাপ ফাইনালিস্ট। 'ওয়ার্ল্ড কাপ অফ টেনিস' ডেভিস কাপ পুরুষদের টেনিসের প্রধান আন্তর্জাতিক দলীয় প্রতিযোগিতা। আন্তর্জাতিক টেনিস ফেডারেশন (আইটিএফ) পরিচালিত বার্ষিক নক-আউট প্রতিযোগিতা।

● **২১ জানুয়ারি থেকে হকি ইন্ডিয়া লিগ :**

আগামী ২১ জানুয়ারি থেকেই শুরু হচ্ছে ভারতীয় হকির সব থেকে বড়ো ইভেন্ট হকি ইন্ডিয়া লিগ। ফাইনাল ২৬ ফেব্রুয়ারি। ২২ নভেম্বর এইচআইএল-এর সূচি ঘোষণা করে হকি ইন্ডিয়া। ওপেনিং ম্যাচ হবে মুম্বইয়ে। রাঁচি রে'স ও দাবাং মুম্বইয়ের মধ্যে। সেমিফাইনাল, ফাইনাল হবে চণ্ডীগড়ে। বাকি ভেন্যুগুলোর মধ্যে থাকছে ভুবনেশ্বর, রাঁচি, দিল্লি, লখনউ। ২১ জানুয়ারি থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে লিগের ম্যাচ। ২৫ ফেব্রুয়ারি হবে দুটি সেমিফাইনাল। ফাইনাল ও তৃতীয় স্থানের ম্যাচ হবে ২৬ ফেব্রুয়ারি। প্লেয়ার কেনাবেচা ও দল তৈরির পর্ব ইতোমধ্যেই সারা হয়ে গেছে।

● **এমসিসি-র ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট কমিটির সুপারিশ :**

গত ৬ ও ৭ ডিসেম্বর বিশ্ব ক্রিকেটের নীতি ও নিয়ম সুপারিশকারী সংস্থা মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাবের ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট কমিটির বৈঠক হয় মুম্বইয়ে। কমিটির অন্যতম সদস্য ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি। বৈঠকে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়। এক, প্রস্তাব দেওয়া হয় ব্যাটের বেধ ৬০ থেকে ৬৫ মিলিমিটারের মধ্যে ও ব্যাটের কিনারার বেধ ৪৫ মিলিমিটার বেঁধে দেওয়ার। দুই, শৃঙ্খলাভঙ্গের (যেমন, আম্পায়ারকে হুমকি, অন্য কোনও ক্রিকেটার, আম্পায়ার, অফিসিয়াল বা দর্শককে মাঠে শারীরিক নিগ্রহ বা যে কোনও হিংসাত্মক কাজে জড়ালে) দায়ে ফুটবল, অ্যাথলেটিক্স, ব্যাডমিন্টনের মতো এবার থেকে ক্রিকেটেও চালু হোক লাল কার্ড। এছাড়াও কমিটি চার দিনের টেস্ট ক্রিকেটের সুপারিশও করতে চলেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার কাছে।

অন্যদিকে, বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী ফিল্ডার বা উইকেটকিপারের হেলমেটে লাগলে ক্যাচ বা স্ট্যাম্প গ্রাহ্য হয় না। এমসিসি-র ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট কমিটির এ ব্যাপারে নতুন সুপারিশ—বল যদি ফিল্ডার বা উইকেটকিপারের হেলমেটে লেগে ফিল্ডারের হাতে যায় বা ফিল্ডার বা উইকেটকিপারের হেলমেটের গ্রিলে আটকে যায় তা হলে ক্যাচ হিসেবে ধরা হবে। যেমন, বর্তমান আইন অনুযায়ী বল উইকেটকিপারের প্যাডের ফাঁকে বা ফিল্ডারের প্যান্টের পকেটে বা সোয়েটারে আটকে গেলে ক্যাচ বলে গ্রাহ্য হয়, ঠিক তেমনই।

● **৭ জানুয়ারি থেকে আই লিগ শুরু :**

আগামী ৭ জানুয়ারি জোড়া ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়ে যাচ্ছে এবারের আই লিগ। প্রথম দিনই ঘরের মাঠে লাজংয়ের মুখোমুখি হবে বেঙ্গালুরু এফসি। অন্য ম্যাচে আইজল এফসি-র ঘরের মাঠে নামবে ইস্টবেঙ্গল। ৮ জানুয়ারি নামছে মোহনবাগান। ওই দিন তিনটি ম্যাচ থাকছে। মোহনবাগান খেলবে ঘরের মাঠে। প্রতিপক্ষ চার্চিল ব্রাদার্স। ১২ ফেব্রুয়ারি আই লিগের প্রথম ডার্বি খেলা হবে। ইস্টবেঙ্গলের হোম ম্যাচ খেলা হবে শিলিগুড়িতে। তবে এই আই লিগের বিশেষত্ব আটটি ভিন্ন রাজ্যের ১০-টি টিম এবং ন'টি ভেন্যু।

● **স্কুল ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন বাংলার মেয়েরা :**

গত ৯ ডিসেম্বর ৬২তম জাতীয় স্কুল গেমস মিনি ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উত্তরপ্রদেশকে হারিয়ে (অনূর্ধ্ব ১৪) মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল বাংলা। ৫ ডিসেম্বর থেকে প্রতিযোগিতা চলছিল মধ্যপ্রদেশের খারগোঁতে। বাংলার ছেলে ও মেয়ে—উভয় দলই গ্রুপ লিগে সবক'টি ম্যাচ জিতে নকআউট পর্যায়ে পৌঁছয়। কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে উত্তরাখণ্ডের কাছে হেরে বিদায় নেয় ছেলেরা। কোয়ার্টার ফাইনালে কর্ণাটক এবং সেমিফাইনালে হরিয়ানাকে হারিয়ে মেয়েরা ফাইনালে ওঠে।

● **ইন্টারন্যাশনাল প্রিমিয়ার টেনিস লিগের তৃতীয় সংস্করণ :**

গত ২ ডিসেম্বর ইন্টারন্যাশনাল প্রিমিয়ার টেনিস লিগের তৃতীয় সংস্করণের টুর্নামেন্ট শুরু হয় জাপানের সাইতামায়। মাঝের পর্ব সিঙ্গাপুরে (৬-৮ ডিসেম্বর)। আর ৯-১১ ডিসেম্বর হায়দরাবাদের গাচ্চিবৌলি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আইপিটিএল-এর চলতি মরসুমের শেষ পর্বের আসর বসে। ২০১৬-র মরসুমে পাঁচ শহরের বদলে খেলা হয় তিন শহরে এবং পাঁচের জায়গায় চারটে টিম অংশগ্রহণ করে—ভারতের 'ইন্ডিয়ান এসেস', জাপানের 'জাপান ওয়ারিয়ার্স', সিঙ্গাপুরের 'সিঙ্গাপুর স্ল্যামার্স' ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর 'ইউএই রয়াল্‌স'। চ্যাম্পিয়ান হয় 'সিঙ্গাপুর স্ল্যামার্স'। ভারত রানার্স-আপ।

● **ব্লাটারের নির্বাসন বহাল :**

২০১৫ সালের ডিসেম্বরে প্রাক্তন ফিফা প্রেসিডেন্ট সেপ ব্লাটার এবং মিশেল প্লাতিনি—এই দু'জনকে ১৩ লক্ষ পাউন্ড 'অনৈতিক লেনদেন'-এর অভিযোগে নির্বাসিত করা হয়েছিল ৮ বছরের জন্য। কিন্তু ফিফার আপিল কমিটি ফুটবলে এই দু'জনের অবদান স্বীকার করে সেই মেয়াদ দু' বছর কমিয়ে দেয়। পরে প্লাতিনি আবার কোর্ট অফ আর্বিট্রেশনে গেলে তার নির্বাসনের মেয়াদ আরও দু' বছর কমে যায়। আর তা দেখার পরেই কোর্ট অফ আর্বিট্রেশনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ব্লাটার। কোর্ট অফ আর্বিট্রেশন (ক্যাস) গত ৫ ডিসেম্বর খারিজ করল ব্লাটারের আবেদন। তার ছ' বছর নির্বাসনের যে শাস্তি বহাল ছিল তা কমার সম্ভাবনা থাকল না।

● **পেশাদারি বিশ্ব খেতাব বিজেন্দ্র সিংহের :**

তানজানিয়ার ফ্রান্সিস চেকা এর আগে কেরিয়ারে ৪৩-টি লড়াইয়ে জিতেছেন ৩২-টিতে। এর মধ্যে ১৭-টি নকআউট। অন্য দিকে, ২০১৫ থেকে পেশাদার বক্সিংয়ে পা রেখে জিতেই চলেছেন তার প্রতিদ্বন্দ্বী, ভারতীয় বক্সার বিজেন্দ্র সিংহ। র‍্যাঙ্কিংয়ে উঠে এসেছেন ১০ নম্বরে। গত ১৭ ডিসেম্বর নয়াদিল্লির ত্যাগরাজ স্টেডিয়ামে চেকাকে হারিয়ে ডব্লিউবিও এশিয়া প্যাসিফিক সুপার মিডলওয়েট খেতাব ধরে রাখলেন ২০০৮-এর অলিম্পিক্স ব্রোঞ্জ জয়ী বিজেন্দ্র।

● **আইএসএল চ্যাম্পিয়ন কলকাতা :**

গত ১৮ ডিসেম্বর কোচিতে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল) ফাইনালে কেরালা ব্লাস্টার্সকে ঘরের মাঠে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল অ্যাটলেটিকো দি কলকাতা। হাফটাইমের আগেই একটি করে গোল করে ফেলে দুই দল—কেরালার রফি ও কলকাতার সেরেনো। দ্বিতীয়ার্ধ গোলশূণ্য হওয়ায় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। তিন বছর আগে, টুর্নামেন্টের প্রথম আসরেও ফাইনালে উঠেছিল কেরালা ও কলকাতা, আর সেই বারও বাজিমাত করে কলকাতা। উল্লেখ্য, শচীন তেণ্ডুলকর ও সৌরভ গাঙ্গুলি যথাক্রমে কেরালা ব্লাস্টার্স ও অ্যাটলেটিকো দি কলকাতার মালিকদের অন্যতম।

● **আইসিসি-র সেরা টিমে ভারতের মন্দনা :**

গত ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৬ মহিলা ক্রিকেট দল ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। এই দলে ভারত থেকে একমাত্র জায়গা করে নিয়েছেন স্মৃতি মন্দনা। 'আইসিসি উইমেনস টিম অফ দ্য ইয়ার'-এর নেতৃত্ব দেবেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্টেফানি টেলর। এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে এক বছরের খেলার ভিত্তিতে। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৬-র মধ্যের পারফরম্যান্সের উপরই নির্বাচিত হয়েছে আইসিসি-র এই বছরের মহিলা ক্রিকেট দল। এছাড়াও এই দলে রয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের আরও একজন (দেন্দ্রা ডটিন), নিউজিল্যান্ডের তিনজন (সুজি বেটস, উইকেটকিপার রাসেল প্রিস্ট এবং লে কাসপেরেক); অস্ট্রেলিয়ার দু'জন (মেগ লেনিং এবং এলিস পেরি), ইংল্যান্ডের দু'জন (হেথার নাইট এবং আনিয়া শ্রুবসল) ও দক্ষিণ আফ্রিকার একজন (সুনে লুস)। আয়ারল্যান্ডের কিম গ্যারেথ ১২তম প্লেয়ার হিসেবে রয়েছেন দলে। নিউজিল্যান্ডের সুজি বেটস ওয়ান ডে এবং টি-টোয়েন্টিতে আইসিসি-র সেরা প্লেয়ারের ট্রফি ছিনিয়ে নিয়েছেন। আটটি ওয়ান ডে-তে বেটসের রান ৫৭২।

● **চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ১৬ :**

গত ১২ ডিসেম্বর ইউইএফএ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ১৬ দলের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। নক্-আউট পর্যায়ে খেলা হবে দু'টি পর্বে—২০১৭ সালে ১৪-১৫ ও ২১-২২ ফেব্রুয়ারি এবং ৭-৮ ও ১৪-১৫ মার্চ। এর আগে তিনবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ১৬-য় দেখা হয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ ও আর্সেনালের—২০০৫, ২০১৩, ২০১৪-এ। একবারও ম্যাচের ফল আর্সেনালের পক্ষে যায়নি। আবারও সামনে এই দুই দল। প্যারিস সাঁ জা আর বার্সেলোনা এই নিয়ে মুখোমুখি হতে চলেছে তৃতীয়বার। ২০১৩ ও ২০১৪-তে এই বার্সেলোনার কাছে হেরেই প্যারিস সাঁ জা-কে ছিটকে যেতে হয়েছিল কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে। রিয়েল মাদ্রিদের সামনে শেষ ষোলোয় নাপোলি। অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ মুখোমুখি হবে বায়ার লেভারকুসেনের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, ম্যানচেস্টার সিটি খেলবে মোনাকো এফসি-র বিরুদ্ধে। বেনফিকা মুখোমুখি হবে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের। পোর্তো-জুভেন্টাসকে দেখা যাবে শেষ ষোলোর লড়াইয়ে। সেভিয়ার সঙ্গে খেলবে লেস্টার সিটি।

● **চতুর্থবার ব্যালন ডি'অর জয় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর :**

চতুর্থবার ব্যালন ডি'অর জিতলেন রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এবং পর্তুগালের হয়ে ইউরো কাপ বিজয়ী ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। চূড়ান্ত পর্বে পিছনে ফেলে দিলেন বার্সেলোনাকে লা লিগা চ্যাম্পিয়ন হতে সাহায্য করা লিওনেল মেসি ও আটলেটিকো মাদ্রিদের ফরাসি ফরোয়ার্ড আঁতোয়া গ্রিজম্যানকে। উল্লেখ্য, ব্যালন ডি'অরের স্কোরলাইনে এখনও মেসি ৫-৪ এগিয়ে।

এই জয়ের দু'দিন পরই নতুন রেকর্ডও করে ফেললেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো—এবার ক্লাবের হয়ে নিজের নামের পাশে লিখে ফেললেন ৫০০তম গোল। গত ১৫ ডিসেম্বর ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ সেমিফাইনালে ক্লাব আমেরিকারকে ০-২ গোলে হারানোর ম্যাচের শেষ মুহূর্তে গোল করে ৫০০ গোলের ক্লাবে ঢুকে পড়লেন তিনি।

● **রোজবার্গের বিশ্বখেতাব জয়, অবসর ঘোষণা :**

গত ৩ ডিসেম্বর ভিয়েনায় এক অনুষ্ঠানে ফর্মুলা ওয়ান থেকে অবসর নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন নিকো রোজবার্গ। মার্সিডিজের হয়ে বিশ্বখেতাব জয়ের মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যেই নিজের ফর্মুলা ওয়ান কেরিয়ার শেষ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা তার। একত্রিশ বছরের এই জার্মান সতীর্থ লুইস হ্যামিল্টনকে টপকে খেতাব জেতেন। ছ' বছর বয়স থেকে কার্টিং শুরু করা রোজবার্গের প্রথম পোডিয়াম ২০০৮ অস্ট্রেলীয় গ্রাঁ প্রি-তে। ২০১০ সালের মার্সিডিজে যোগ দেন তিনি। লুইস হ্যামিল্টনের সঙ্গে তার পার্টনারশিপের সৌজন্যে ফর্মুলা ওয়ান ট্র্যাকে কৃতিত্ব জাহির করে মার্সিডিজ। ২০১৪ এবং ২০১৫-র চ্যাম্পিয়ন হ্যামিল্টনকে হারিয়ে এ বছর বিশ্বখেতাব জেতেন রোজবার্গ। প্রসঙ্গত, ১৯৯৩-এ অ্যালেইন প্রস্তের পরে এই প্রথম বর্তমান কোনও চ্যাম্পিয়ন অবসর ঘোষণা করলেন।

● **কার্লসেনের বিশ্ব দাবায় জেতার হ্যাটট্রিক :**

গত ৩০ নভেম্বর, নরওয়ের ম্যাগনাস কার্লসেন বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার হ্যাটট্রিক করেন। ২০১৩ ও ২০১৪ সালে দাবার খেতাবি লড়াইয়ে হারিয়েছিলেন বিশ্বনাথন আনন্দকে। গত বছর ফিডে বিশ্ব র‍্যাপিড খেতাব জেতার পরে এ বছর নিজের ছাব্বিশতম জন্মদিনে ফের বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ন হলেন রাশিয়ার সের্গেই কারইয়াকিনকে হারিয়ে।

একজনের দখলে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ার রেকর্ড—কারইয়াকিন ১২ বছর ৭ মাস। অন্যজন সেই তালিকার তিন নম্বরে—কার্লসেন ১৩ বছর ১৪৮ দিন। কিন্তু তার পরে কারইয়াকিনকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছেন কার্লসেন। নিউইয়র্কে কার্লসেন র‍্যাপিড দাবার কারইয়াকিনকে দ্রুত ও আক্রমণাত্মক চালে মাত করেন। যেখানে দু'জনের প্রথম বারো গেমের দশটা ড্র ছিল। প্রায় তিন সপ্তাহের লড়াইয়ে দু'জনে একে অন্যকে হারাতে পেরেছিলেন মাত্র একবার করে। তবে র‍্যাপিড দাবার কার্লসেনের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং ১।

● **স্টিভেন জেরার্ডের অবসর :**

গত ২৪ নভেম্বর পেশাদার ফুটবল থেকে অবসর ঘোষণা করেন প্রাক্তন লিভারপুল ও ইংল্যান্ড অধিনায়ক ৩৬ বছর বয়সী স্টিভেন জেরার্ড। ১৭ বছর লিভারপুলে টানা খেলেছেন। তার মধ্যে ১২ বছরই ছিলেন অধিনায়ক। ইংল্যান্ডের হয়ে ১১৪-টি ম্যাচ খেলেছিলেন জেরার্ড। ২১-টি আন্তর্জাতিক গোলও রয়েছে তার। তার আগে শুধু রয়েছেন পিটার শিলটন, ওয়েন রুনি ও ডেভিড বেকহ্যাম। ছ'টি বড়ো টুর্নামেন্টের মধ্যে ইংল্যান্ডের হয়ে ২০১০-এর বিশ্বকাপ, ২০১২-র ইউরো ও ২০১৪-র বিশ্বকাপে অধিনায়কত্ব করেছেন। এছাড়া দু'টো এফএ কাপ, তিনটি লিগ কাপ, উয়েফা কাপ, উয়েফা সুপার কাপ ও কমিউনিটি শিল্ড জয় রয়েছে তার ঝুলিতে। সব থেকে বড়ো সাফল্য ২০০৫ সালে ইস্তানবুলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে প্রথমার্ধে ৩-০ পিছিয়ে থেকে এসি মিলানকে হারিয়ে পঞ্চম ইউরোপিয়ান কাপ জিতে নেয় লিভারপুল। ক্লাবের হয়ে ৭১০-টি ম্যাচ খেলে ১৮৬ গোল রয়েছে তার।

বিবিধ

● **কুয়াশার আগাম খবরে নতুন দিশা :**

কবে কুয়াশা হবে আর কবে হবে না, এখন তার একটা সাধারণ পূর্বাভাস দেওয়া হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে সেটা বিশেষ কার্যকর হয় না। কেননা কুয়াশা হলে তা কতটা গাঢ় হবে বা কতটা হাল্কা, সেটা নির্দিষ্ট করে বলতে পারে না আবহাওয়া দপ্তর। ফলে সেই কুয়াশায় বিমান বা ট্রেন চালানো যাবে কি না, বিমান পরিবহণ বিভাগ বা রেল নির্দিষ্টভাবে তা জানতে পারে না। সেই জন্য কোনও রকম আগাম পরিকল্পনা করতে পারে না তারা। এত দিনে সেই পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হচ্ছে। ব্যবস্থা বদল করে এবার কুয়াশার পূর্বাভাস অনেকটা নির্দিষ্টভাবে দিতে চাইছে মৌসম ভবন। নতুন ব্যবস্থায় পাঁচ দিন আগে থেকেই কুয়াশার খবর আরও নির্দিষ্টভাবে দেওয়া সম্ভব। এই কাজে যুক্ত আছে কানপুর আইআইটি, স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার, বিআইটি মেসরা, বায়ুসেনা, পুণের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিক্যাল মেটেরিওলজি। বিভিন্ন বিমানবন্দর-সহ দেশের কুয়াশাপ্রবণ জায়গা থেকে বাতাসের জলীয় বাষ্প ও তাপমাত্রার তথ্য নেওয়া হবে। বিমান ও রেল পরিবহণের জন্য নির্দিষ্টভাবে কুয়াশার পূর্বাভাস দেওয়ার কাজ শুরু করা হবে সেই সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করেই। ১ ডিসেম্বর ২০১৬ থেকে এই কাজ চলবে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত। আপাতত কলকাতা, গুয়াহাটি, আগরতলা, মোহনবাড়ি, পাটনা, ভুবনেশ্বর বিমানবন্দরের তথ্য বিশ্লেষণ করে কুয়াশার পূর্বাভাস দেওয়া হবে।❑

সংকলক : রমা মন্ডল এবং পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী

(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

UNDAC

আকস্মিক আপৎকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলায় দ্রুত হস্তক্ষেপের জন্য রাষ্ট্রসংঘের বিপর্যয় নিরূপণ ও সমন্বয়সাধন ব্যবস্থার অঙ্গ United Nations Disaster Assessment and Coordination (UNDAC)। মানবতা বিষয়ে সমন্বয়সাধন সংক্রান্ত দপ্তর Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) সংশ্লিষ্ট সরকারের অনুরোধে ১২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পীড়িত দেশটিতে একটি UNDAC দল পাঠিয়ে দেয়, তা সে পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তেই হোক না কেন। আকস্মিক বিপর্যয়-পরবর্তী পরিস্থিতিতে UNDAC দল মূলত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ, প্রভাবিত অঞ্চলে সমন্বয় ও তথ্য ব্যবস্থাপনার মতো প্রযুক্তিগত পরিষেবা প্রদান করে।

১৯৯৩ সালে UNDAC প্রতিষ্ঠা করা হয়। উদ্দেশ্য, বিপর্যয় মোকাবিলার ক্ষেত্রে অন্তর্দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে যোগাযোগ বৃদ্ধি ও সমন্বয়সাধন। প্রয়োজন হলে, বিপর্যয়গ্রস্ত দেশের স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করতে সেখানে আন্তর্জাতিক সহায়তার বিষয়টি দেখভালের জন্য রাষ্ট্রসংঘ 'On-site Operations Coordination Centre' (OSOCC) স্থাপন করে। OCHA-র কর্মী, রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য সংস্থা-সহ ১৬-টি আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের পাশাপাশি ৭০-টিরও বেশি দেশ UNDAC-এর সঙ্গে সদস্য ও অংশগ্রহণকারী হিসেবে যুক্ত।

এর পাশাপাশি, সহায়তা প্রদান করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের সংস্থাগুলি যাতে অ-সরকারি সংস্থা (NGO)-র মতো অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে, সেজন্য OCHA একটি গুচ্ছ-ভিত্তিক কাঠামো গড়ে তুলেছে। এ ধরনের ১১-টি আলাদা গুচ্ছ (cluster) আছে। প্রত্যেকটির নির্দিষ্ট ভূমিকা ভিন্ন এবং এগুলি রাষ্ট্রসংঘের এক বা একাধিক সংগঠন/সংস্থার আওতাধীন। UNDAC-এর দল ও OCHA-র গুচ্ছ, উভয়ই সংশ্লিষ্ট দেশে রাষ্ট্রসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী (UN Resident Coordinator) ও রাষ্ট্রসংঘের মানবতা বিষয়ক সমন্বয়কারী (UN Humanitarian Coordinator)-এর সঙ্গে বোঝাপড়া রেখে একসাথে প্রচেষ্টা চালায়।

বেশির ভাগ গুচ্ছই বিপর্যয় মোকাবিলার ক্ষেত্রে 'response phase' বা তড়িঘড়ি হস্তক্ষেপের পর্বে কাজ করে। তবে, পূর্বাবস্থাপ্রাপ্তি জন্য প্রয়োজনীয় দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ নিতে United Nations Development Programme (UNDP) বা রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি 'Early Recovery Cluster' গড়ে তুলেছে। এর মাধ্যমে UNDP মানবতা বিষয়ক সহায়তা প্রদানের সঙ্গে উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের সমন্বয়সাধন করে। এই গুচ্ছের লক্ষ্য সাহায্যমূলক কর্মসূচির সুফলগুলিকে সঙ্কট-পরবর্তীকালের সুস্থায়ী পুনর্গঠন, স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নের সুযোগে রূপান্তরিত করা।❑

সংকলক : ভাটিকা চন্দ্রা

Books on Rashtrapati Bhavan

(i) Work of Beauty : The Architecture and Landscape of the Rashtrapati Bhavan

This exhaustive volume documents the entire landscape around and architecture of the Rashtrapati Bhavan estate, starting from its construction as Government House, after the capital of British India shifted from Calcutta to Delhi in 1911.

(ii) First Garden of the Republic : Nature in The President's Estate.

First Garden of the Republic documents the flora and fauna of the Estate across the season. It shows how human agency creates and curette this habitat and explores how plants and animals make the President's Estate their own, adapting it to their ends, and the challenges these living creatures and their habitats face today.

(iii) Around India's First Table : Dining and Entertaining at the Rashtrapati Bhavan

This volume traces the history of dining and entertaining at Rashtrapati Bhavan from the days when the British viceroys served French food in the stately dining room, through the early years of the republic, and the gradual replacement from Western to Indian cuisine. The reader is take behind the scenes to follow the careful preparations which make India's first table a site for successful gastronomic diplomacy.

(iv) Arts and Interiors of the Rashtrapati Bhavan

This volume extensively documents and catalogues the various artworks on display in the lush interiors of the vast Rashtrapati Bhavan estate. It includes vivid descriptions about the history and stylistic features of the furniture, paintings. It also covers interesting information about textiles, murals, and carpets that adorn the estate, illustrated with pictures of artworks, reproduction of plans and rare archival documents, the reader gets an entry into the magnificent world and is made familiar with the general interior design of the Rashtrapati Bhavan.

(v) Discover the Magnificent World of Rashtrapati Bhavan

This short volume aims to acquaint children with the fascinating story of the Rashtrapati Bhavan–how it was built, the events it has witnessed and the role that it plays in the life of the nation and the people who live and work there, through interesting stories, fascinating facts and descriptive chapters.

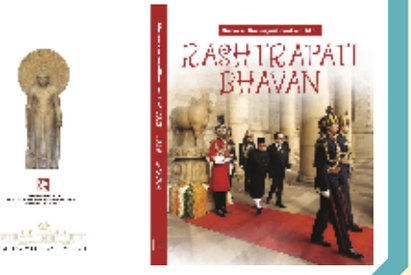

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 22.00

January, 2017
R.N.I. No. 19740/69

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

MO No. _____ Date _____

The MO should be send to

The Editor, Dhanadhanye (Yojana - Bengali)

Publications Division, 8, Esplanade East, Kolkata - 700 069

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐☐☐☐☐☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

ATTENTION PLEASE

Send your Subscription through Bharatkosh (Non-Tax Receipt Portal),

or

by Online Money transfer/RTGS through following Bank Details

"Business Manager, Publications Division, Kolkata"

State Bank of India, (Esplanade East Branch)

A/c No. 34060545985

IFS Code No. SBIN0001971

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯, ফোন ঃ ২২৪৮ ২৫৭৬ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।